মনের উপর
লাগাম
ইবনুল-জাওযী রহ.
অনুবাদ: মাসুদ শরীফ

বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। তবে কী পড়তে হবে তা নিয়ে অধিকাংশ পাঠকই উদাসীন। পেটের দায়ে যে বিদ্যার্জন হয় সেটা দিয়ে উদরপূর্তি হলেও মনের আত্মরক্ষার জন্য ভিন্ন কিছু দরকার। সস্তা মানের গল্প পড়ে মনের বাসন হয়তো-বা মেটে, আত্মার অপমৃত্যু রোধ করতে কি তা যথেষ্ট?

এই প্রশ্ন থেকেই একটি নতুন স্বপ্ন বুনেছি আমরা। স্বপ্নটির নাম দিয়েছি 'ওয়াফি পাবলিকেশন'। কেবল মনোরাজ্যের তুষ্টির জন্য নয়, বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করতে আমরা কাজ করতে চাই। অন্ধকার মনের প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উন্মোচন করে সত্যিকারের স্বশিক্ষিত জাতি হিসেবে নিজেদের উপস্থাপন করতে চাই। ফিতনার ঘোর অন্ধকারে আলো জ্বেলে দিতে চাই। পথিককে জ্ঞানের পথ দেখিয়ে দিতে চাই। আমাদের এই পথ চলায় আপনিও হোন আমাদের সাথি ...

মন ভালো নেই। চারপাশে অনেক সুখোপকরণ; কিন্তু তাও ভালো লাগছে না কিছুই। কারণ, মনটা ভালো নেই। মনের ব্যাপারস্যাপার বোঝা শক্ত। কোন কাজে সে ভালো থাকবে, কোনটাতে মন্দ তা আমরা নিজেরাও বুঝি না।

মাতাল যখন মদ খেতে থাকে সেটুকু সময় সে ভালো থাকে—অন্তত সে তা-ই মনে করে। যখন মাদকতা কেটে যায়, বাস্তবতায় ফিরে আসে তখন খারাপ লাগাটা আগের চেয়ে বাড়ে বৈ কমে না। ক্ষণিক ফূর্তি কি আসলে ভালো লাগা? যা ইচ্ছে তা-ই করলে কি মানুষ ভালো থাকে?

আত-তিব্বুর-রূহানী মনের ম্যানুয়াল।

কী করলে আদতে মন ভালো থাকবে, প্রশান্তিতে থাকবে সে কথা এই বইতে আছে। মানসিক অসুখের খাসা-সব ওষুধের কথা এই বইতে বলা আছে। এই ওষুধ সরাসরি মনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া। এই দাওয়াইয়ের তাই কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। বইটা পড়ার সাথে সাথে জগতের সব সুখ ধরা দেবে তা হবার নয়। পড়ে মানতে হবে। অবাধ্য মনটাকে আস্তে আস্তে বশ করতে হবে। সময় লাগবে।

তবে সেই সময়টা পার হলে আপনি বুঝে যাবেন কীসে মন খারাপ করতে হয়, আর কীসে করতে হয় না। তখন আপনি জীবনের একটা অর্থ খুঁজে পাবেন। আপনার মন খারাপেরও অর্থ থাকবে, উপযুক্ত কারণ থাকবে। আর সে মন খারাপ নিছক আবেগের নয় বলে সেই খারাপ থাকা মনটা নিয়েও আপনি শান্তিতে থাকতে পারবেন।

আর মন যখন ভালো থাকবে তখন ঠিক কারণে ভালো থাকবে। সে মুহূর্তগুলোতে আপনি কষ্টভরা দুনিয়াতেও জান্নাতের আবেশ পেয়ে যাবেন।

মননশীল এই বইটা মন্ময় হয়ে পড়ুন। আখেরে ভালো থাকবেন।

— শরীফ আবু হায়াত, *সরোবর সামাজিক উদ্যোগ*

শাইখ ইবনুল-জাওযীর ﷺ বইটি পড়লাম। চমৎকারভাবে মানবীয় দোষগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেল যেন। সাথে বাতলে দিয়েছেন এসব থেকে পরিত্রাণের উপায়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনটা দোষেগুণে ভরপুর। গুণের চেয়ে দোষের পাল্লাটাই ভারী। রাগ করা, নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা, অমিতব্যয়ী হওয়া, অতিভোজন, অপচয়, লোভ-লালসা, কিপটামি, মিথ্যা বলা ইত্যাদি যেন আমাদের মজ্জাতে মিশে যাচ্ছে দিন দিন। শাইখ এখানে দারুণভাবে এসবের সমালোচনা করেছেন এবং এসব থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তা দেখিয়েছেন।

বইটি এককথায় চমৎকার। মাসুদ শরীফ ভাইয়ের সরল এবং প্রাঞ্জল অনুবাদ যেন বিষয়গুলোকে বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য আরও সহজ করে তুলেছে। আল্লাহ যেন শাইখ এবং অনুবাদকের শ্রমকে কবুল করেন—আমীন...।

— আরিফ আজাদ, *প্যারাডক্সিকাল সাজিদ*

হরেক রকম অসুখে ভুগি আমরা। দেহের অসুখ, মনের অসুখ। প্রথমটা দৃশ্যমান, রোগের অস্তিত্ব টের পাওয়া। শুরু হলেই কালবিলম্ব না করে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। দ্বিতীয়টা নিজের কাছে সহজে প্রকাশ পায় না—প্রতিবিধান করতে বিলম্ব হয়ে যায় হরহামেশাই। তাছাড়া মনের অসুখ এত বেশি বিচিত্র যে, এগুলোর গতিপ্রকৃতি বোঝাও মুশকিল। এই ধরনের অসুখ, অসুখের নেপথ্য তত্ত্ব এবং পথ্য-সম্পর্কিত তথ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কুরআন ও সুন্নাহর পাতায় পাতায়। ইমাম ইবনুল-জাওযী ﷺ সেগুলোকে একত্র করে *আত-তিব্বুর রূহানী* গ্রন্থের অবতারণা করেছেন। সেই কালজয়ী গ্রন্থের সফল বাঙলায়ণ *মনের উপর লাগাম।*

অগ্রজপ্রতিম কথাশিল্পী জনাব মাসুদ শরীফ অনুবাদক হিসেবে ইতোমধ্যেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ। মূল গ্রন্থ ও অনুবাদের পাণ্ডুলিপি পাশাপাশি রেখে মিলিয়ে দেখার পর মনে হচ্ছিল, লেখক যদি বাঙলা-ভাষাভাষী হতেন, বোধ করি ঠিক এভাবেই তিনি লিখতেন। এই মন্তব্য যে মোটেও অত্যুক্তি নয়, পাঠক তাঁর পাঠযাত্রার বাঁকে বাঁকে সহসাই উপলব্ধি করতে পারবেন।

শুদ্ধাচারী হৃদয়ের সবুজ তৃণভূমিতে জন্মানো আগাছা উপড়ে ফেলার জন্যে এই গ্রন্থ নিড়ানি হয়ে কাজ করবে। বিশ্বাসী অন্তরের ভারী নিশ্বাসকে হালকা করার জন্যে *মনের উপর লাগাম* হতে পারে একটি আগাম প্রতিষেধক।

— আবদুল্লাহ মাহমুদ নজীব, *শেষ রাত্রির গল্পগুলো*

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

মনের উপর লাগাম

প্রকাশকের কথা

সকল প্রশংসা বিশ্বজাহানের রব আল্লাহর জন্য। শান্তি ও করুণা বর্ষিত হোক রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবি ও তাঁর হিদায়াতের অনুসারীদের উপর।

মানুষ নিজেকে বদলাতে চায় না। স্বভাবসুলভ কিছু অভ্যাসের উপর জীবনকে ছেড়ে দিয়ে বেমালুম বেহুঁশ হয়ে আছে। জীবন যেদিকে যাচ্ছে যাক—দেখার কিছু নেই। গৎবাঁধা কাজকর্ম আর উদ্দেশ্যবিহীন গন্তব্যে আবর্তিত হচ্ছে দিন, মাস, বছর। কোনো নতুনত্ব নেই, কোনো পরিবর্তন নেই।

আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি, অধিকাংশ মানুষ স্বীয় মনের ইচ্ছাধীন। অদৃশ্য মনের হুকুমে উঠবোস করছে তারা—নিজেদের উপর বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণ নেই। ঠিক এখানেই ব্যর্থ এবং সফল মানুষের মধ্যে পার্থক্য। এ কারণেই অধিকাংশ মানুষ পিছিয়ে থাকে; অল্পসংখ্যক মানুষ অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী হয়।

মানুষ যে-সকল মনের ব্যাধিতে আক্রান্ত সেগুলোর সমাধান নিয়েই জগদ্বিখ্যাত মুসলিম মনীষি ইবনুল-জাওযী (ﷺ) *আত-তিব্বুর-রূহানী* নামক একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন।

“রূহ” শব্দের আভিধানিক অর্থ আত্মা। “আত-তিব্বুর-রূহানী” বলতে আসলে বোঝায় আত্মিক চিকিৎসা। বিষয়বস্তু অনুসারে বাংলা অনুবাদে নাম দেওয়া হচ্ছে “মনের উপর লাগাম”। এই বইতে মানুষের নেতিবাচক স্বভাবসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলোর সমাধান সবিস্তারে আলোকপাত করা হয়েছে। সুন্দর

কথামালায় সাজানো তাঁর এই নাসীহাতগুলো আমাদের সবার জন্য কার্যকর হবে ইনশা'আল্লাহ।

অনুবাদক মাসুদ শরীফ ভাষার ব্যাপারে অতি যত্নবান। তার সরল বাক্যবিন্যাস ও প্রাঞ্জল শব্দচয়ন লেখার মানকে উৎকৃষ্ট করে তুলেছে। আশা করছি পাঠকবৃন্দ রচনার সহজাত স্বাদ তৃপ্তিসহকারে উপভোগ করবেন।

শার'ঈ সম্পাদনার গুরুদায়িত্বটি পালন করেছেন প্রিয় ভাই আব্দুল্লাহ আল মাসউদ। তার অক্লান্ত শ্রম ও মেধা দ্বারা সমুদয় কাজটিকে পূর্ণতা দিয়েছেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে তার পরামর্শগুলো ভুলবার নয়।

প্রচ্ছদ, পৃষ্ঠাসজ্জা, যাচাইকরণ, মুদ্রণসহ প্রতিটি ধাপেই অসংখ্য মানুষের সহযোগিতা পেয়েছি। কীভাবে সর্বোত্তম উপায়ে সবাইকে ধন্যবাদ দেওয়া যায় জানা নেই। এই দায়িত্বটি আমি পাঠকদের উপর অর্পণ করলাম। বইটি আপনাদের ব্যক্তিগত জীবনে সামান্যতম উন্নতি আনতে সক্ষম হলেই আমরা সার্থক।

পরিশেষে একটিই কথা, গ্রন্থটির অনুবাদ নির্ভুল রাখার জন্য আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। যদি কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ত্রুটি আপনাদের দৃষ্টিগোচর হয়, আমাদের অবগত করার বিনীত অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে আমরা শুধরে নেব ইনশা'আল্লাহ।

আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন এ প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। তিনি যেন এ বইটি সকল বিদ্যার্থীদের জন্য কল্যাণদায়ক করে দেন। আমীন।

লেখকের কথা

পাঠক, মানুষের জন্য আল্লাহ যা কিছু বরাদ্দ রেখেছেন তার সবই তাদের মঙ্গলের জন্য। হয় কোনো উপকারের জন্য—যেমন ক্ষুধা—অথবা কোনো ক্ষতিরোধের জন্য—যেমন রাগ। কিন্তু ক্ষুধা যদি বেশি বেড়ে যায় তা হলে সেটা অতিভোজনে রূপ নেয়। তখন কিন্তু সেটা ক্ষতিকর। আবার রাগ যদি বেসামাল হয়, মানুষ তখন অশান্তি সৃষ্টি করে।

বেশ কয়েকটি উদ্দেশ্য মাথায় রেখে আমি এই বইটি লিখেছি:

- মনকে সঠিক সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রণ
- খায়েশের মুখে লাগাম পরানো
- অসুস্থ ইচ্ছার চিকিৎসা

পরবর্তী ৩০টি অধ্যায়ে এ বিষয়গুলো আমি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করেছি।

সূচি

বিবেকের গুণ

বিবেক কী, এর অবস্থানই-বা কোথায়—এ নিয়ে মানুষের অনেক কথা। বিস্তর আলোচনা। বিবেকের গুণাগুণ নিয়ে হাদীসও কম নয়। এর কিছু কিছু আমি আমার *যাম্মুল-হাওয়া* (খায়েশের সমালোচনা) বইতে উল্লেখ করেছি। সেজন্য এখানে আবার সেগুলো উল্লেখ করছি না; বরং সেখান থেকে একটা অংশ তুলে দিচ্ছি:

কোনো জিনিসের গুণাগুণ তার ফলাফল থেকে বোঝা যায়। মন যদি তার স্রষ্টাকে চিনতে পারে সেটাই তার সেরা সাফল্য। এই মন স্রষ্টার অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তাভাবনা করে একসময় তাকে চিনতে পেরেছে। নবিদের সত্যবাদিতা নিয়ে ভেবে একসময় তা বুঝতে পেরেছে। সে তখন আল্লাহ্ ও তাঁর বার্তাবাহক রাসূলদেরকে অনুসরণের উৎসাহ দিয়েছে।

কঠিন জিনিস হাসিল করতে মন নানা পরিকল্পনা করে। এই যেমন মন তার কৌশল খাটিয়ে অবাধ্য পশুকে বশ মানিয়েছে। সাগরের বিশাল জলরাশি পেরিয়ে যেখানে পা ফেলা মানুষের জন্য এককালে অসাধ্য ছিল, জাহাজ বানিয়ে তাকে সেখানে যাওয়ার উপায় শিখিয়েছে। শিখিয়েছে কীভাবে উড়ন্ত পাখিকে শিকার করতে হয়। এর সবই মানুষ করেছে তার প্রয়োজনে। নিরাপদে থাকার খাতিরে।

বিবেক মানুষকে শিখিয়েছে কেন পরকালের জন্য দুনিয়ার মোহ ছাড়তে হবে। এটা আছে বলেই পশুপাখির উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। মানুষ তাই আল্লাহর কথা ও অনুশাসন শোনার যোগ্যতা অর্জন করেছে। জ্ঞানে ও কাজে অর্জন করতে পেরেছে দুনিয়া-আখিরাতের সর্বাধিক কল্যাণ। তার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য এগুলোই যথেষ্ট।

কামনার সমালোচনা

মন যখন যা চায়, তা-ই পেতে চাওয়ার নাম ‘হাওয়া’ বা কামনা। সে-চাওয়া যদি বৈধ হয়, তা হলে তো সমালোচনার কিছু নেই। তবে তারপরও খুব বেশি নিজের কামনার পিছে ছোটা যাবে না। কামনার অনুসরণ মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে অবশ্যই সমালোচনা করতে হবে। আর যদি অবৈধ বা অনুমতিহীন কিছু হয় তখন তো নিন্দা করতেই হবে। আবার অনুমতি থাকলেই লাগামহীনভাবে তাতে জড়িয়ে পড়া যাবে না।

মনের একটা অংশ বুদ্ধিদীপ্ত। এর গুণ প্রজ্ঞা; দোষ অজ্ঞতা। এর কিছু অংশে থাকে রাগ। এর গুণ তেজ; আর দোষ কাপুরুষতা। এর কিছু অংশে আছে লিপ্সা। এর গুণ সংযম; আর দোষ লাগামহীন লালসা।

বিপদের মুখে ধৈর্য ধরা মনের একটা বিশাল গুণ। এর মাধ্যমেই মানুষ ভালোখারাপ সহ্য করে। যার ধৈর্য নেই, কামনার উপর লাগাম নেই, সে কাতারের সামনে না থেকে চলে গেছে পেছনে। সে যেন প্রজাকে বানিয়েছে তার নেতা। যা থেকে সে মনে করে উপকার পাবে সেটা তার ক্ষতি করে। যা থেকে সে মনে করে সুখ পাবে সেটা তাকে দুঃখ দেয়।

বিবেক আছে বলেই মানুষ পশুপাখি থেকে আলাদা। বিবেকের কাজ খায়েশের পিছু পিছু যাওয়া থেকে বারণ করা। আপনি যদি বিবেককে পায়ে ঠেলে খায়েশের গোলামি করেন, আপনি তখন জন্তু-জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট হবেন। শিকারি কুকুর আর রাস্তাঘাটে ঘোরাঘুরি করা কুকুর দেখলেই বিষয়টা বুঝবেন। শিকারি কুকুরের আলাদা সম্মান আছে। দাম আছে। কারণ, ইচ্ছার উপর

লাগাম টানার ক্ষমতা আছে তার। শাস্তির ভয়ে কিংবা মনিবের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তারা মনিবের শিকার নিজের কাছে নিরাপদে রাখে।

নাবিকহীন জাহাজ যেমন স্রোতের টানে উদ্দেশ্যহীন ভেসে যায়, খায়েশ ঠিক সেরকম মানুষের স্বভাবকে ইচ্ছেমতো নাচায়। সমঝদার মানুষ হিসেবে বলুন তো: খায়েশের লেজ ধরে একবার চলা শুরু করলে, ভবিষ্যতে এর যে খারাপ পরিণাম হবে সেটা সহ্য করা সহজ, নাকি শুরুতেই খায়েশ চেপে ধরার কষ্ট সহ্য করা সহজ?

খায়েশের অনুসরণের সবচেয়ে করুণ পরিণাম হচ্ছে মানুষ সেই খারাপ কাজটা করতে একসময় আর কোনো মজা পায় না। কিন্তু অভ্যাসবশত করে যায়। নিজেকে সেখান থেকে উদ্ধার করতে পারে না। এ ধরনের খারাপ কিছুতে অভ্যস্ত হলে তা আসক্তিতে রূপ নেয়। মদপান কিংবা অবাধ যৌনসম্পর্কে যারা আসক্ত তাদের অবস্থা এমনই।

খায়েশের মুখে লাগাম আঁটবেন কীভাবে? এর খারাপ দিকগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। নিজেকে নিয়ে ভাবলে পরে বুঝবেন, খায়েশের গোলামির জন্য আপনার জন্ম হয়নি। উট আপনার চেয়ে বেশি খায়। পাখিরা আপনার চেয়ে সহবাস বেশি করে। জানোয়ারদের কামনা লাগামহীন। কিন্তু ওতে ওদের কিছু যায় আসে না।

মানুষের পিপাসা যখন কমে যায়, বার্ধক্যে পৌঁছায় তখন তার উপলব্ধি হয় কামনার পেছনে ছোটার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়নি।

যেসব কামনা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গেছে সেগুলো নিন্দিত। বিবেকবুদ্ধি এগুলোকে নিচু বলে জানে। অন্যদিকে আত্ম-উন্নয়নের ইচ্ছেগুলো প্রশংসিত।

বিবেকের চোখ, কামনার চোখ

পাঠক, কামনার পেছনে ছোটার সময় মানুষ আগপিছ চিন্তা করে না। সে কিন্তু ঠিকই জানে এই কাজে তৃপ্তির চেয়ে যন্ত্রণা বেশি। অন্যান্য আরও অনেক তৃপ্তি থেকে বঞ্চনা তো আছেই। কামনার প্রলোভনে এসব চিন্তা তখন মাথা থেকে হারিয়ে যায়। সে পশুর স্তরে নেমে যায়। পশুদের তো তবু সাফাই আছে। পরিণামের খেয়াল না করলেও চলবে তাদের। চিন্তাশীল মানুষের সেই সুযোগ কোথায়?

দেখুন, মানুষ হিসেবে আপনার অবস্থান অনেক সম্মানিত। উঁচু অভিজাত আপনার মর্যাদা। সমঝদার মানুষ কখনো পশুদের স্তরে নামে না। নামতে পারে না। কারণ, বিবেক কাজের ফলাফল নিয়ে ভাবে। সে দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও কল্যাণকামী ডাক্তারের মতো পরামর্শ দেয়।

কামনা অনেকটা বেখেয়াল বালকের মতো। কিংবা অসুস্থ লোভী ব্যক্তির মতো। কামনা তো বায়না ধরবেই। আপনার বিবেক যদি সেটাকে ঠিক না ভাবে তা হলে তার সঙ্গেই সলাপরামর্শ করুন। এই বিবেক জ্ঞানী। উপদেশের বেলায় আন্তরিক। বিবেক যা বলে তাতে ধৈর্য ধরুন। আপনি তো ভালো করেই এর শ্রেষ্ঠতা জানেন। কামনার উপর মনের শাসনকে প্রাধান্য দিতে আর কি কিছুর প্রয়োজন আছে?

মনের সিদ্ধান্ত ঠিক আছে কিনা সে ব্যাপারে যদি আরও প্রমাণ লাগে তা হলে ভাবুন তো একবার: খায়েশের পা চাটলে কী ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে? মানুষের সামনে আপনার কলঙ্কের হাঁড়ি ভেঙে যাবে। কুৎসা ছড়াবে। ভালো

ভালো আমল ছুটে যাবে আপনার। খেয়ালখুশির জিন্দেগি চালিয়ে অপমান-অপদস্থ আর দুর্ভোগের শিকার হওয়া ছাড়া আর কী জুটেছে কপালে?

আচ্ছা, খায়েশটা পূরণ করলে কী পাবেন? না হয় কিছু একটা পেলেনই; তারপর? ক্ষণিক তৃপ্তিবোধটা চলে যাওয়ার পর কী অবস্থা হবে তখন? এই অপরাধবোধের জ্বালা নিয়ে ভাবলে পরে বুঝবেন যা পেয়েছেন তার দ্বিগুণ খুইয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে একটা কবিতা বলি:

কত ভোগ সুখের মরীচিকার দিকে ডেকেছে
কিন্তু দিয়েছে কেবল দুঃখ আর কষ্ট
কামনার কত ছোবল
ধর্ম আর গুণের আচ্ছাদন সরিয়ে
মানুষকে উলঙ্গ করে ছেড়েছে

খেয়ালখুশি মতো কাজ করলে অপদস্থ হবেনই। কামনার গারদে বন্দি জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছু পাওয়ার আশা করে লাভ নেই। কিন্তু একবার যদি একে পায়ে ঠেলে চলতে পারেন তা হলে সেই জীবন হবে মর্যাদার, গর্বের। নিজেকে মনে হবে ভুবনজয়ী।

কখনো কি খেয়াল করেছেন, ভীষণ ধার্মিক কারও সান্নিধ্য পেলে প্রবল শ্রদ্ধায় মানুষ তার হাতে চুমু খায় কেন? ওরকম মাটির মানুষকে দেখলে মানুষ বোঝে, কামনার সামনে তারা যেরকম হাত-পা ছেড়ে আত্মসমর্পণ করেছিল, এরা সেরকম নন। নিজেদের খেয়ালখুশিকে পিষে ফেলার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী তারা।

প্রেম যে কত মানুষকে ধ্বংস করেছে, তার খবর কে জানে! কারও শরীর, কারও ধর্ম, কারও-বা দুটোই প্রেমনদীর গর্ভে বিলীন হয়েছে। *যাম্মুল-হাওয়া* (খায়েশের সমালোচনা) বইতে প্রেমের ভূত তাড়ানোর বেশ কিছু প্রতিষেধকের কথা বলেছি। তার কিছু কিছু এখানেও বলছি।

এই রোগ তাড়ানোর প্রথম ওষুধ হচ্ছে চোখ নামিয়ে রাখুন। এটাই মোক্ষম দাওয়াই। নাহলে অন্য অনেকের মতো আপনাকে এই রোগে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে।

ক্যানসারের মতো প্রেমজীবাণু সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ার আগেই যদি প্রতিকার করা যায় তা হলে ফায়দা পাবেন। কিন্তু একবার যদি সেটা গভীর প্রণয়ে রূপ নেয়, তা হলে এই চিকিৎসা কাজে আসার সম্ভাবনা খুব কম।

আকাঙ্ক্ষিত কিছুর দিকে অসতর্কে চোখ পড়ে গেলে প্রেম জন্মায় না। কিন্তু বারবার যদি তাকাতেই থাকেন, আপনার মনের লোভ আর যৌবনের আকর্ষণ হাত ধরে টেনে আপনাকে প্রেমে পড়াবে।

তাই বাঁচতে চাইলে ক্যানসার হওয়ার আগেই পদক্ষেপ নিন। যা কিছু যত উপায়ে প্রেমের উস্কানি দেবে তাতে বাধা দিন। যেহেতু দৃষ্টি সবার আগে যায়, তাই চোখ নামিয়ে রেখে প্রথম বাঁধটা তৈরি করতে হবে। এজন্য ধৈর্য ধরে সহ্য করতে হবে কিছুদিন। আত্মনিয়ন্ত্রণ আর মনের শক্তি সেরা ওষুধ। এই ওষুধে সাহায্য পাবেন আল্লাহকে ভয় করলে। কুকীর্তির কথা জানাজানি হলে যে লাঞ্ছনাকর পরিস্থিতিতে পড়বেন সেটা কল্পনা করলেও কাজে দেবে। যার প্রতি

প্রেম জেগেছে তার ভেতরের দোষত্রুটির কথাও স্মরণ রাখুন। ইবনু মাস'ঊদ বলেছেন, "কারও যদি কোনো নারীকে ভালো লাগে, তা হলে সে যেন তার খুঁতের কথা মাথায় রাখে।"

যদি বিয়ের সামর্থ্য থাকে এবং বিয়ে করা যদি বৈধ হয়, তা হলে কারও প্রতি প্রেম জাগলে বিয়ে করতে পারলে ভালো। বিয়ে করলে এই রোগের তীব্রতা কমবে। আরও বেশ কিছু উপায় আছে:

- একাধিক বিয়ে
- উপপত্নী।[১]
- লম্বা দূরত্বের সফর
- ভালোবাসার মানুষ থেকে পাওয়া ধোঁকার কথা মনে করা
- ধার্মিকতা দুনিয়াবিমুখতা *(যুহদ)* বিষয়ক বই
- মৃত্যুর কথা স্মরণ
- রোগী ও কবরস্থান দেখতে যাওয়া

যা চাচ্ছেন তা পাওয়ার পর যে একটা অনীহা চলে আসবে সেটা নিয়ে ভাবুন। জীবিত মানুষের সদাপরিবর্তিত মনের কথাও মাথায় রাখুন। অন্যদের থেকেও সাহায্য নিতে পারেন। কখনো কখনো অন্যরাও আপনাকে ধ্বংসের তীর থেকে উঠে আসতে সাহায্য করতে পারেন।

মনে রাখবেন, মাত্র একটি ভুলের কারণে প্রথম পুরুষ প্রথম নারী আদাম হাওয়াকে জান্নাত ছেড়ে নশ্বর পৃথিবীতে নেমে আসতে হয়েছিল। আল্লাহ তাদের দুজনের উপর শান্তি বর্ষণ করুন।

---

[১] ক্রীতদাসী উপপত্নী রাখা নিয়ে সংশয় দূর করতে দেখুন: ডা. শামসুল আরেফীন, দক্ষিণ হস্ত মালিকানা, 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড', ঢাকা: মাকতাবাতুল আযহার, ২০১৭। —সম্পাদক

যখন যা মন চায় তা-ই খাওয়াকে সাধারণত শারাহ বলে। এটা যে মানুষকে কত ক্ষতির দিকে টেনে নিয়ে যায় তার অনেক নজির আছে। খায়েশি খাসলত থেকে এর উৎপত্তি।

আল-হারিস ইবনু কিলদাহ[১] বলেছেন, “একবার খেয়েছে। তার উপর আবার খাচ্ছে। এভাবেই বন্য পশুরা নিজেদের মৃত্যু ডেকে আনে।” অন্যরা বলেছেন, “মৃতদের যদি মৃত্যুর কারণ, জিজ্ঞেস করা হয়, তারা বলবে অতিভোজন।”

আল-হাসান বলেছেন, সামুরাহকে একবার বলা হলো তার ছেলে সারারাত ধরে ঘুমোতে পারছে না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন সে কি খুব বেশি খেয়েছে। তারা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। তিনি তখন বললেন, “ও যদি মারা যায়, তা হলে আমি ওর জানাযার সালাত পড়ব না।”

এক লোক আরেক লোককে নিন্দা করে বলেছিল, “আপনার বাবা মারা গিয়েছেন বেশি খেয়ে খেয়ে। আর মা মারা গিয়েছেন বেশি পান করে করে।”

---

[১] আরব অঞ্চলের সবচেয়ে বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন তিনি। তা'ইফ অঞ্চলের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিও ছিলেন তিনি। পারস্য অঞ্চলে দুবার সফর করেন। সেখান থেকেই চিকিৎসা-বিদ্যা শেখেন। ইসলাম আবির্ভাবের আগে তার জন্ম। খালীফাহ মু'আউইয়ার সময় পর্যন্ত তিনি বেঁচে ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিনা তা নিয়ে ‘আলিমগণ একমত নন। কেউ অসুস্থ হলে নবিজি ﷺ তাদেরকে তার কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিতেন। তার জ্ঞানবুঝ ভালো ছিল। কিসরা আনূশরুয়ানের সাথে কথোপকথন নিয়ে তিনি ‘চিকিৎসা কথন’ নামে একটি বই লিখেছিলেন। সূত্র: আয-যারকালি, আল-‘আলিম, ২/১৫৭।

'উকবাহ্ আর-রাসসিবী একবার আল-হাসানের বাড়িতে গিয়েছিলেন। হাসান তখন দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন। 'উকবাকে দেখে তার সাথে খেতে বসতে বললেন। তিনি জানালেন তার পেট ভরা। শুনে আল-হাসান বললেন, "সুবহান আল্লাহ! কোনো মুসলিম কি পেট ভরা পর্যন্ত খেতে পারে!?"

অতিভোজন

পাঠক, বিবেকবান লোক বাঁচার জন্য খায়। আর বেখেয়ালি লোক খাওয়ার জন্য বাঁচে। বেশি খেয়ে খেয়ে অনেক মানুষ কম বয়সে মারা গিয়েছেন। *লাকতুল-মানাফি'* বইতে ভরপেট খাওয়ার নানা সমস্যা আমি তুলে ধরেছি। এত বেশি খাবেন না যাতে নিজেরই ক্ষতি হয়। 'মনের গুণ' আর 'কামনার সমালোচনা' অধ্যায়ে যা বলেছি, সেটা মানলেই নিজেকে নানা পাপ আর ক্ষয়ক্ষতি থেকে দূরে রাখতে পারবেন।

অত্যধিক দৈহিক মিলন

শারাহ্ হতে পারে বেশি বেশি দৈহিক মিলনের বেলাতেও। *আল-লাকত* বইতে এ ব্যাপারেও বলেছি। কেউ যদি খুব বেশি সহবাস করে, তা হলে তার শুক্রাণু গ্রন্থি একসময় খালি হয়ে যায়। তাতে অনুপযোগী জিনিস ঢুকে পড়ে। আর এতে করে মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড আর লিভারের মতো শরীরের প্রধান প্রধান অঙ্গগুলো কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। একসময় দৈহিক মিলনের চাহিদা মারাত্মকভাবে কমে যায়। দ্রুত ক্ষয় হয়।

সন্তান নেওয়ার ইচ্ছা কিংবা বিয়ে-বহির্ভূত দৈহিক মিলনের শঙ্কা ঠেকানো সহবাসের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কিন্তু সেটা যদি ভোগ আর তৃপ্তির জন্য কারও অভ্যাস হয়ে যায়, তা হলে বাস্তবে সে আসলে পশুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে।

সম্পদ স্তূপ করা

সম্পদ স্তূপ করা বিষয়টাও এক ধরনের শারাহ। দরকারের চেয়ে বেশি টাকাপয়সা জমানোকে বলে 'ঠান্ডা পাগলামি'। শুধু টাকার জন্য টাকার পেছনে ছুটবেন না। নিজেকে, নিজের ছেলেমেয়েদের যেন অন্যের কাছে হাত পাততে না হয় সেজন্য অর্থ উপার্জন করবেন। অভাবীদেরকে দান করবেন। এটা খুব প্রশংসনীয় কাজ। বিবেকবান মানুষ হিসেবে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু আয় করার পর, অযথা আর বাড়তি টাকা কামানোর ধান্দায় দেশ-বিদেশ ঘুরে ঘুরে মূল্যবান সময় স্বাস্থ্য নষ্ট করবেন না। এক কবি খুব সুন্দর করে বলেছেন:

টাকার স্তূপ করার জন্য যে দিন কাটায়
দারিদ্রের আশঙ্কায়,
সে যা করল সেটাই দারিদ্র

কত মানুষের কথা শুনেছি দেখেছি, হাড়কিপটে; বুড়ো হওয়ার পরও পয়সার ধান্দায় দেশবিদেশ বাণিজ্যসফর করছে। তারা অবশ্য দাবি করেন মুনাফা অর্জনের জন্য তাদের এসব সফর। কিন্তু ওগুলো করতে করতেই একদিন তাদের মৃত্যু আসে। অথচ অনেক চাওয়াই তখনো অপূর্ণ।

এই রোগ সারানোর জন্য প্রথমে টাকা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য বুঝুন। অর্থ উপার্জন আর নিজের সবচেয়ে মূল্যবান দুই সম্পদ স্বাস্থ্য ও সময়—এগুলোর লাভ-ক্ষতির মাঝে তাল ঠিক রাখুন। নিজের বিবেকের সাথে সলাপরামর্শ করলে বিষয়টা বুঝে যাবেন। কিন্তু সম্পদের স্তূপ করার নেশা যদি পেয়ে বসে, তা হলে লোভের মরুভূমিতে ধ্বংস হয়ে যাবে সে। তখন তার একমাত্র উত্তরসূরি হবে পাহাড় আর বাক্সপেটরা।

অপচয়

সুন্দর সুন্দর শিল্প—এই যেমন ঘর-বাড়ি সাজানো, দামি ঘোড়া [আমাদের সময়ে গাড়ি], জাঁকজমক পোশাক—এরকম আরও অনেক কিছুতেও শারাহ হতে পারে। এখানেও অসুখের বীজ সেই খায়েশ।

এর চিকিৎসার জন্য কিছু বিষয় জানাচ্ছি। উপার্জন হালাল হলেও পাই পাই করে হিসেবে দিতে হবে। অপচয় হারাম, কাজেই সাবধান হতে হবে। অহংকার করে যে তার পোশাক মাটিতে হেঁচড়ে হেঁচড়ে চলে আল্লাহ তার দিকে ফিরেও তাকাবেন না।

একজন মু'মিন বিশ্বাসীকে আল্লাহ সবকিছুর জন্য পুরস্কার দেবেন। কিন্তু বাড়িঘর বানানোর জন্য কিছু নেই। আপনি যদি বুদ্ধিমান হন, তা হলে নিশ্চয় আপনি চিন্তা করবেন আপনার শেষ গন্তব্য কোথায়, কতদিন আর এই পৃথিবীতে আছেন আপনি। তখন দেখবেন যে-পোশাক পরে আছেন আর যে-বাড়িতে মাথা গুঁজেছেন তাতেই সুখ খুঁজে পাচ্ছেন।

বর্ণিত আছে নূহ নবি খুব দুর্বল একটা বাড়িতে কাটিয়ে দিয়েছেন ৯৫০ বছর। আমাদের নবিজি ﷺ থাকতেন কাদামাটির তৈরি বাড়িতে। খালীফাহ 'উমার ইবনুল-খাত্তাবের পোশাকে ১২টা তালি ছিল। কেন তারা এভাবে থাকতেন? কারণ, তারা খুব ভালো করে বুঝে নিয়েছিলেন, এই দুনিয়া হচ্ছে সেতু। সেতুকে কখনো ঘর হিসেবে নিতে নেই।

আপনি যদি এসব বিষয়ে সচেতন না হন তা হলে শারাহ রোগে পড়বেন। এই রোগ সারাতে চাইলে পড়াশোনা করুন। বিজ্ঞ 'আলিমদের জীবনী নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন।

দুনিয়াবি পদের লোভ

মানুষের মন অন্যের উপর কর্তৃত্ব করতে ভালোবাসে। এজন্য আদেশ-নিষেধ দেওয়ার ক্ষমতা পেতে মানুষ নেতৃত্বকে হাতে নিতে চায়। নেতৃত্ব কর্তৃত্ব দরকার হলেও তাতে ঝুঁকি অনেক। নিম্নতম ঝুঁকি হচ্ছে ক্ষমতালাভের পর অপসারিত হওয়া। আর সবচেয়ে মারাত্মক হলো শাসনকার্যে বেইনসাফি। আর মাঝামাঝি অবস্থা হলো দায়িত্বশীল লোক যদি আন্তরিক না হয় তা হলে অযথা তার সময় নষ্ট।

নেতৃত্ব কর্তৃত্বের মোহ যদি থাকে তা হলে কিছু বাস্তব কথা শুনুন। না পাওয়া পর্যন্ত এই ক্ষমতাকে খুব বিশাল কিছু মনে হয়। কিন্তু একবার হাতে পেলে তার আবেদন ম্লান হয়ে যায়। আরও বড় কিছুর জন্য মন তখন উসখুস করে।

একটা জিনিস না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষার যে মজা, পাওয়ার পর কিন্তু সেটা আর থাকে না। কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা অবৈধ হলে পরে সেই মজা না থাকলেও পাপটা কিন্তু রয়ে যাবে। তাছাড়া নিজের জীবনের ঝুঁকি আর ধর্ম পালনের সমস্যার বিষয়গুলো তো আছেই। এসব ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করলে দেখবেন নেতৃত্ব কর্তৃত্বের মোহ কেটে যাচ্ছে।

মানুষের নেতা হতে চাওয়াটা যে কী ভয়ংকর একটা ব্যাপার সেটা নবিজির ﷺ মুখ থেকে শুনুন,

> “দশজন কিংবা এর বেশি লোকের নেতা যে-ই হবে, বিচার দিনে গলায় হাত বাঁধা অবস্থায় তাকে আল্লাহর সামনে হাজিরা দিতে হবে। তার ন্যায়নিষ্ঠা তাকে বাঁচাবে। নইলে তার অত্যাচার তাকে নাশ করে দেবে। এর [নেতৃত্বের] শুরু হয়

> নিন্দা দিয়ে। মাঝে থাকে আফসোস। আর শেষ হয় বিচারদিনে অপমান দিয়ে।"[১]

শাসকদের ব্যাপারে নবিজি ﷺ আরও মারাত্মক কথা বলেছেন:

> "শাসকদের দুর্ভাগ্য! সেনাপতিদের দুর্ভাগ্য! কর্তৃত্বশীলদের দুর্ভাগ্য! কিয়ামাতের দিন কিছু লোক আফসোস করে বলবে, দায়িত্ব পাওয়ার বদলে মহাকাশের কৃত্তিকা নক্ষত্র থেকে তাদের কপাল যদি ঝুলত; আর তারা মহাকাশ ও পৃথিবীর মাঝে দুলত!"[২]

সাহাবি আবূ যার একবার নবিজিকে ﷺ বলেছিলেন,

> "আল্লাহর রাসূল, আমাকে কোনো কিছুর দায়িত্ব দেবেন না?"
>
> নবিজি ﷺ তখন তার কাঁধে চাপড় মেরে বললেন, "আবূ যার! তুমি যে অনেক দুর্বল। দায়িত্ব একধরনের আমানাত। যারা বৈধভাবে দায়িত্ব পাবে এবং তার উপর অর্পিত বাধ্যবাধকতা পালন করবে তারা ছাড়া বিচারদিনে বাকি সবার জন্য এটা হবে চরম অপমানের কারণ।"[৩]

অন্য আরেক বর্ণনায় দেখা যায় নবিজি ﷺ বলছেন,

> "আবূ যার, আমার জন্য যা ভালোবাসি, তোমার জন্যও তা-ই ভালোবাসি। তোমরা দুজন হলে তুমি আগবাড়িয়ে নেতা হতে চেয়ো না। এতিমের সম্পদের জিম্মাদার হোয়ো না।"[৪]

---

[১] আত-তাবারানি, আল-কাবীর ৮/২০৪, আহমাদ ৫/২৬৭, ইবনু 'আসাকির ৫/৩৫৬, আশাজারি ২/২২৬।

আল-হায়সামি তার মাজাম'উল-যাউা'ইদ বইয়ে বলেছেন (৫/২০৪): আহমাদ ও আত-তাবারানি বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনাসূত্রে আছেন য়াযীদ ইবনু আবূ মালিক। ইবনু হিব্বান ও অন্যান্যরা তাকে সত্যয়ন করেছেন। এছাড়া এই বর্ণনাসূত্রের বাকি সবাই নির্ভরযোগ্য।

[২] আহমাদ ২/৩৫২, আল-বায়হাকী ১০/৯৭, ইবনু 'আসাকির ৬/১৭১।

[৩] মুসলিম ১৮২৫।

[৪] মুসলিমের বর্ণনায় আছে: "আবূ যার, তুমি তো দুর্বল। আমি নিজের জন্য যা ভালোবাসি তোমার জন্যও তা-ই ভালোবাসি। দুজন হলে তাদের নেতা হোয়ো না। এতিমের সম্পদের দায়িত্ব নিয়ো না।"

কিপটামি খাসলত

টাকাপয়সা সঞ্চয় করাটা কৃপণতা না। কেউ তার নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা বা প্রয়োজনে কিংবা ছেলেমেয়ে আত্মীয়স্বজনের জন্য জমিয়ে রাখতে পারে। এটাকে হিসেবি স্বভাব বলে। এটা দোষের না। আবার কেউ কেউ সম্পদ সঞ্চয় করে নিজেকে শক্তিশালী অবস্থায় রাখতে পারেন। এতেও সমস্যা নেই। আসলে কৃপণ হলো সেই লোক যে তার সম্পদ থেকে ফরজ অংশটা দেয় না। ইবনু 'উমার বলেছেন, "যে যাকাত দেয় সে কৃপণ না।" দান করলে নিজের তেমন কোনো সমস্যা হবে না—বলতে গেলে কিছুই হবে না—তারপরও যে-লোক অন্যের উপকারে টাকা ঢালে না তারাই কঞ্জুস।

কিপটামি স্বভাবকে নবিজি ﷺ রোগের সঙ্গে তুলনা করেছেন:

> "কৃপণতার চেয়ে বড় রোগ আর কী আছে![১]"

আবূ মুহাম্মাদ আর-রামাহুরমুযি বলেছেন,

> কঞ্জুস স্বভাব রোগের মতো মানুষের ক্ষতি করে। রোগ যেমন তার শরীরকে দুর্বল করে দেয়, চাহিদাকে মিটিয়ে দেয়, রং পরিবর্তন করে দেয়, কঞ্জুস স্বভাব তার সম্মান ছিনিয়ে নেয়। তার জন্য নিয়ে আসে দুর্নাম ও নিন্দা।

---

[১] আল-মুসতাদরাক ৩/২১৯, ৪/১৬৩-১৬৪, আল-আদাবুল-মুফরাদ ২৯৬, মুসান্নাফ 'আবদুর-রায্‌যাক ২০৭০৫, তাফসীর তাবারানী ১০/১০৪, আহমাদ ৩/৩০৭-৩০৮। বর্ণনাকারী জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ।

জ্ঞানী লোকেরা বলতেন, "দানশীল মানুষই স্বাধীন, কারণ, সে তার টাকার মালিক। কিন্তু কঞ্জুস লোক স্বাধীন মানুষ তকমা পাওয়ার যোগ্য না। কারণ, টাকা তার মালিক।"

এই বদস্বভাব যেন আমাদের খাসলতে পরিণত না হয়ে সেজন্য নবিজি ﷺ সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

> "কঞ্জুস হওয়া থেকে সতর্ক হও। তোমাদের আগে বহু লোককে এটা বিনাশ করে দিয়েছে। এটা তাদেরকে বলেছে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রেখো না। তারা রাখেনি। তাদেরকে বলেছে কৃপণ হও। তারা হয়েছে। বলেছে চরিত্রহীন কাজে জড়িয়ে যাও। তারা জড়িয়েছে।" [১]

তিনি আরও বলেছেন,

> "বিশ্বাসীদের মধ্যে দুটো স্বভাব মিশতে পারে না: কৃপণতা আর অনৈতিকতা।" [২]

আল-খাত্তাবী বলেছেন, "কৃপণ কথাটার চেয়ে অর্থলোভী শব্দটা বেশি সুনির্দিষ্ট। কৃপণ হলো একটা ধরন। আর অর্থলোভী হলো একটা জাত।"

কেউ কেউ বলেছেন, "কঞ্জুসি মানে টাকা জমা করে রাখা। আর অর্থলোভিতার মানে টাকার সাথে সাথে সৎকাজও উঠিয়ে রাখা।"

---

[১] আহমাদ ২/১৬০, ১৯৫, আবূ দাউদ ১৬৯৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমারের বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় নবিজি ﷺ বলেছেন, "অর্থলোভী হওয়া থেকে সতর্ক থাকো। তোমাদের আগে বহু লোককে এটা বিনাশ করে দিয়েছে। এটা তাদের বলেছে কৃপণ হতে, তারা হয়েছে। এটা তাদেরকে বলেছে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রেখো না। তারা রাখেনি। বলেছে চরিত্রহীন কাজে জড়িয়ে যাও। তারা গেছে।"

আল-খাত্তাবী বলেছেন, "কৃপণ কথাটার চেয়ে অর্থলোভী শব্দটা বেশি সুনির্দিষ্ট। কৃপণ হলো একটা ধরন। আর অর্থলোভী হলো একটা জাত।" কৃপণতার কথাগুলো ব্যক্তিগত ও বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে বলা। অন্যদিকে অর্থলোভী শব্দটা সাধারণ অর্থবোধক। এটা অনেকটা ওসব মানুষের মজ্জাগত।

কেউ কেউ বলেছেন কৃপণতা মানে টাকা ধরে রাখা। অর্থলোভিতা মানে টাকাপয়সার সাথে মায়াদয়াও আটকে রাখা।

এখানে চরিত্রহীন কাজ বলতে মিথ্যা বলাকে বোঝানো হয়েছে। এই শব্দের উৎসের মানের সত্য থেকে সরে আসে। বলা হয়, সে চরিত্রহীন হয়েছে মানে সত্য থেকে সরে গেছে।

[২] আত-তিরমিযী ১৯৬২। আবূ নু'আইম, আল-হিল্‌য়াহ ২/৩৮৯। বর্ণনাকারী: আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী রা.।

বিশ্র আল-হাফি বলেছেন, “কৃপণ লোকের সাথে দেখাসাক্ষাৎ বিশ্বাসী লোকদের মনে যন্ত্রণার কারণ।”

একটু ভাবলে এই অসুখ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। দেখুন, গরিব লোকেরাও আপনার ভাই। সম্পদের বলে আল্লাহ আপনাকে অন্যদের উপর রেখেছেন। বাকিদেরকে মুখাপেক্ষী করেছেন। সুতরাং এসব গরিবদুখি মানুষদের অর্থসহায়তা করে আপনার উচিত আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করা। এই সম্পদের মালিক তো তিনিই আপনাকে বানিয়েছেন।

দান করলে অন্যরা আপনার অনুগত থাকে। কৃপণ হলে খারাপ লোকেরা আপনার মর্যাদা নষ্ট করে ফেলবে। নিশ্চিত থাকুন যা আছে শিগগিরই বাজেভাবে আপনার হাত থেকে চলে যাবে। তাই ও আপনাকে ছেড়ে যাওয়ার আগে আপনিই ওকে ছেড়ে দিন (টাকাপয়সা আপনার হাত থেকে চলে যাওয়ার আগে নিজেই সেটা দান করে দিন)।

পয়সা ওড়ানো

খায়েশের হুকুম মেনে মানুষ যেসব খারাপ কাজ করে তার মধ্যে অপচয় বা পয়সা ওড়ানো অন্যতম। বিবেক খাটালে মানুষ পয়সা ওড়াতে পারত না। এক্ষেত্রে সেরা শৃঙ্খলা হলো আল্লাহর শৃঙ্খলা। সুমহান আল্লাহ বলেছেন,

“অপব্যয় করে অপচয় কোরো না।” [আল-ইসরা’ ১৭:২৬]

আপনাকে হয়তো পুরো মাসের জীবিকা এক দিনেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আপনি যদি তা অপচয় করে উড়িয়ে দেন, তা হলে বাকি মাস ধুঁকে ধুঁকে চলতে হবে। যদি হিসেব করে চলেন, তা হলে বাকি মাস আরামে থাকবেন।

অপচয় অসুখের চিকিৎসার জন্য নিজের খামখেয়ালিপনার পরিণাম নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন। ভবিষ্যৎ প্রয়োজন ও দারিদ্রের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। এতে করে আপনার পয়সা ওড়ানোর খায়েশে লাগাম পড়বে।

আয়-ব্যয়ের ব্যাখ্যা

বুদ্ধিমান মানুষের আয় তার ন্যূনতম প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হয়। বিপদে যেন কাজে লাগে এজন্য তারা কিছু টাকা সঞ্চয়ও করে। হতে পারে কখনো হয়তো কামাই রোজগারের জন্য কোনো সমস্যার কারণে কাজ করতে পারছেন না। এই সঞ্চয় তখন খুব কাজে আসবে। সন্তান হলে টাকা লাগবে। আরেকটি বিয়ে করতে চাইলে টাকা লাগবে। চাকরবাকর প্রয়োজন হলেও টাকার দরকার। আবার সন্তানের যদি টাকাপয়সার প্রয়োজন হয়, তা হলেও তো টাকা চাই। তাই জীবিকা যথেষ্ট কি না সেটা খেয়াল রাখবেন।

মোদ্দাকথা ব্যয়ের চেয়ে আপনার আয় বেশি হতে হবে। তা হলে কিছু টাকা বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে টাকা সঞ্চয় হবে না। তখন বিপদে পড়লে কূলকিনারা খুঁজে পাবেন না। পরিণামের কথা চিন্তা করে বলে বিবেক কিন্তু আপনাকে এই উপদেশই দেয়। কিন্তু খায়েশের চিন্তা শুধু আজকের জীবন নিয়ে। কাল কী হবে সেটা নিয়ে ওর কোনো মাথাব্যথা নেই।

আবূদ-দার্দা' বলেছেন, "গভীর বুঝদার মানুষ ভবিষ্যৎ জীবনের ভাবনা আগে থেকে ভেবে রাখে।"[১]

---

[১] প্রাগুক্ত। বর্ণনাকারী থেকে মাওকূফ হিসেবে বর্ণিত। [মাওকূফ: যে হাদীসের বর্ণনাসূত্র (ইসনাদ) সাহাবি পর্যন্ত গিয়ে থেমে গেছে। —সম্পাদক]

মিথ্যা

খায়েশ মানুষকে যতকিছুর দিকে ডাকে, তার মধ্যে এটা সবচেয়ে খারাপ। নেতা হওয়ার জন্য, লোকজনের উপর ছড়ি ঘোরানোর জন্য মানুষ খবর দিতে, শিক্ষক হতে পছন্দ করে। সে ভালো করে জানে বক্তার মর্যাদা শ্রোতার চেয়ে বেশি।

এই অসুখের চিকিৎসা করতে হলে মিথ্যাবাদীর জন্য আল্লাহর শাস্তিটা ভালো করে জানতে হবে। লাগাতার মিথ্যা কথা বলে গেলে নিশ্চিত থাকুন একদিন না একদিন মানুষের সামনে সেই মুখোশ খুলে পড়বেই। এরপর তার মুখে এমন চুনকালি পড়বে যা মোছার আর কোনো উপায় থাকবে না। তার কলঙ্ক শুধু বাড়বেই। তার উপর মানুষের এমন অশ্রদ্ধা জন্মাবে যে, পরে আর কখনো সত্য কথা বললেও লোকে তাকে বিশ্বাস করবে না। মিথ্যা বলার কারণে তার উপর মানুষের আস্থা নাই হয়ে যাবে।

নবিজি ﷺ বলেছেন,

> "একটা লোক মিথ্যা বলতে থাকে। এভাবে বলতে বলতে এমন অবস্থা হয় যে আল্লাহর কাছে সে মিথ্যাবাদী হিসেবে নাম লেখায়।"[১]

ইব্‌নু মাস'ঊদ ﵁ বলেছেন, "ধোঁকাবাজি আর মিথ্যা বলা ছাড়া একজন বিশ্বাসী মুসলিমের সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্বভাবজাত।"[২]

---

[১] মুসলিম, কিতাবুল-বিরর্ ওয়াল-সিলাহ (ধার্মিকতা, ভালো আচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা), হাদীস নং ১০৫।

[২] আশ-শিফা ১/২১৫, আল-ইতহাফ ৭/৫১৮। বর্ণনাটির রাফ' হওয়াকে দুর্বল বলেছেন আল-বায়হাকী। আদ-দারাকুতনীর মতে এটা মাওকূফ হওয়া বেশি সঠিক। [মাওকূফ: যে হাদীসের বর্ণনাসূত্র

হিংসা তাড়ানোর উপায়

আমি না পেলে নাই, কিন্তু অন্যের কাছে এটা থাকতে পারবে না—এমন চিন্তার আরেক নাম হিংসা। অন্যের চোখে আমি আলাদা হব, অন্য কেউ আমার সমান হতে পারবে না—এ ধরনের অসুস্থ চিন্তা থেকে এই রোগের উৎপত্তি। এই রোগে পড়লে অন্য কাউকে ভালো অবস্থানে যেতে দেখলে হিংসুকের মনে জ্বালা শুরু হয়। অন্য কেউ তার সমান হয়ে যাচ্ছে, আলাদা মর্যাদা পাচ্ছে—এটা তার সহ্য হয় না। যে-মুহূর্তে সেই লোকের নেয়ামতটা চলে যায়, তার জ্বালাও তখন বিলকুল দূর হয়ে যায়।

মনের ভেতর এক ফোঁটাও হিংসে নেই এমন মানুষ বিরল। তবে মনে হিংসা থাকলেই পাপ হয় না। পাপ হয় যখন কেউ চায় অন্যের নেয়ামতটা চলে যাক।

হিংসার কারণে ঘুমে সমস্যা হয়, খাওয়াদাওয়া কমে যায়, চেহারা মলিন হয়ে যায়, মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে পড়ে, বিষণ্ণতা লেগে থাকে। ১২০ বছর বয়সী এক বুড়ো যাযাবরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "আপনার এত বছর বাঁচার রহস্য কী?" তিনি বলেছিলেন, "হিংসা করা ছেড়ে দিয়েছি। তাই এত বছর বেঁচেছি।"

আরেকটা জিনিস জেনে রাখুন। মানুষ কিন্তু শুধু দুনিয়াবি বিষয়আশয় নিয়ে একে অপরকে হিংসা করে। আপনি কিন্তু কখনো দেখবেন না যে কেউ রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়ছে বলে বা নিয়মিত সিয়াম পালন করছে বলে তাদেরকে কেউ হিংসা করছে। 'আলিমদের জ্ঞানের কারণেও কেউ তাদের হিংসা করে না; হিংসা করে তাদের খ্যাতির কারণে।

(ইসনাদ) সাহাবি পর্যন্ত গিয়ে থেমে গেছে। —সম্পাদক]

হিংসার রোগ যদি বাসা বেঁধেই ফেলে, তখন কী করবেন?

দেখুন, আল্লাহ সবকিছু আগে থেকে নির্ধারিত করে রেখেছেন। সেটার রদবদল করা অসম্ভব। তিনি *আর-রাযযাক*। জীবিকা বণ্টনকারী। তিনি সুবিচারক প্রজ্ঞাবান। সবকিছুই তাঁর হাতে। তিনিই দেন। তিনিই নেন। মহাকাশ এবং এর মাঝে যা কিছু আছে সব তাঁরই সৃষ্টি। তো আপনার মনে যদি অন্যকে নিয়ে হিংসে হয়, তা হলে বিষয়টা এমন দাঁড়াচ্ছে যে, আপনি খোদ আল্লাহর ইচ্ছার উপর নাক গলাচ্ছেন।

এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছিলেন, "তোমাকে যে হিংসে করে তাকে জিজ্ঞেস করো, 'তুমি কি জানো কার বিরুদ্ধাচরণ করছ তুমি? যিনি আমাকে এই নি'আমাহ দিয়েছেন তুমি তার বিরুদ্ধাচরণ করছ।'

"তিনি আমাকে যা দিয়েছেন তুমি তাতে সন্তুষ্ট না। আমার উপর তোমার হিংসের ক্ষতিপূরণ হিসেবে আল্লাহ আমার নি'আমাহ একের পর এক বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমার মুখের উপর তোমার আয়রোজগারের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।"

তাছাড়া আপনি যাকে নিয়ে হিংসে করছেন সে কি আপনার ভাগ থেকে কিছু নিয়েছে? তারপরও আপনি যে চাচ্ছেন তার অনুগ্রহ কেড়ে নেওয়া হোক এটা কি অবিচার না?

যাকে হিংসা করছেন তার অবস্থা আরেকবার ভালো করে দেখুন। সে যদি দুনিয়াবি কিছু পেয়ে থাকে তা হলে তো হিংসা না করে তার জন্য দুঃখ করা উচিত। কারণ, সে যা পেয়েছে সেটা তার ক্ষতির কারণ, হতে পারে। দুনিয়াবি জিনিসের সাথে ঝামেলা পাল্লা দিয়ে বাড়ে।

আল-মুতানাব্বি বলেছেন, "ছেলেটা তার জীবনের, তার প্রয়োজনের কথা বলেছে। অথচ জীবিকার বাড়তি অংশটা তো শুধুই ঝামেলা।"

ধনী তার টাকাপয়সা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকে। যার অনেকগুলো দাসী আছে, তাদের নিয়ে তার সব সময় দুশ্চিন্তা হয়। অনেক খেয়াল রাখতে হয়। শাসক

ভয় করে কখন না জানি তাকে উৎখাত করা হয়। কত অনুগ্রহের ভিড়ে কত যে বিষণ্ণতা! ওসব অনুগ্রহ সামান্য কদিনের। ওগুলোর পিছে পিছে তুফানের মতো ধেয়ে আসে দুর্ভাগ্য। যার আছে সে আতঙ্কে থাকে—এই বুঝি শেষ হয়ে গেল, কিংবা সে নিজেই তা ফেলে দিল।

আপনি যাকে যে-কারণে হিংসা করছেন, তার অনুগ্রহটাকে যত বড় করে দেখছেন, তার কাছে তা মোটেও অত বড় বা দামি কিছু না। মানুষের একটা স্বভাব কী জানেন? তারা ভাবে কেউ বড় বড় কোনো পদে আছে মানে তারা অনেক সুখী। কিন্তু মানুষ আসলে জানে না, কেউ যখন খুব করে কিছু চায়, আর একসময় যখন তা পায়, আগের সেই আকর্ষণ আর বেশিদিন টেকে না। তখন এরচেও দামি কিছু চাই তার। অথচ হিংসুক ব্যক্তি স্বভাবদোষে উল্টো ভেবে মাথা কুটে কুটে মরছে।

অন্যের হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরাটাই আপনার জীবনের সবচেয়ে নিকৃষ্ট শাস্তি। যাকে হিংসা করছেন তারও সাধ্য নেই যে এর চেয়ে জ্বালাময় কোনো শাস্তি আপনাকে দেবে।

এত কিছুর পরও যদি হিংসারোগ না যায়, তা হলে যার উপর এত হিংসা, তার সাফল্য অর্জনের জন্য নিজেই মাঠে নেমে পড়ুন।

ন্যায়নিষ্ঠ পূর্বসূরিদের একজন বলেছিলেন, “আমি তো এমনকি হিংসুকের উদ্বেগকেও ভয় পাই। প্রতিবেশী ধনী বলে যে তাকে হিংসা করে, দেখা যায় তার মতো ধনী হতে সে তখন ব্যবসা করার জন্য সফর করছে। কারও জ্ঞানের কারণে কেউ যদি অন্যকে হিংসা করে, তা হলে দেখা যাবে সারা রাত জেগে সে পড়াশোনা করছে। তবে আজকাল মানুষ এমন অবস্থায় পৌঁছেছে, তারা আলসেমিকে বড় ভালোবাসে। এরপর কেউ যখন উঁচু অবস্থানে পৌঁছায় তখন তাকে নিয়ে অন্যায় সমালোচনা করে।”

আর-রাদী কী সুন্দর বলেছেন,

...আমি সেই সফেদ সুন্দর পবিত্র ঘোড়া।
সবার চোখ আমার 'পর
যখন তারা ঘুমিয়ে থাকে
আমি তখন রাত কাটাই
উঁচু থেকে আরও উঁচুতে উঠতে
যদি না অপর আমায় সম্মান করত
শত্রুরা কখনো আমায় নামাতে চাইত না

এতকিছু বলার পরও, যাকে হিংসা করছেন তার অনুরূপ মর্যাদা অর্জন করতে যদি পরিশ্রম করতে না পারেন, তা হলে অন্তত সেই লোকের নামে কুৎসা রটনা আর সমালোচনা করা থেকে মুখটাকে বন্ধ রাখার জিহাদে নামুন। মনের হিংসা মনেই চেপে রাখুন।

হিংসার সমালোচনা

হিংসার নিন্দা করে অনেক হাদীস আছে। নবিজি ﷺ বলেছেন,

> "তোমাদের আগেকার জাতির অসুখ তোমাদের দিকে চুপিসারে ধেয়ে আসছে। অসুখ দুটো হলো হিংসা আর ঘৃণা। ঘৃণা হলো ক্ষুর। এই ক্ষুর চুল কাটে না। ধর্মকে কামিয়ে ফেলে। যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, একে অপরকে ভালো না বাসা পর্যন্ত তোমরা মু'মিন হতে পারবে না।
>
> "যা করলে তোমরা একে অপরকে ভালোবাসবে সেটা বলব? নিজেদের মধ্যে সালাম ছড়িয়ে দাও।[১]"

'উমার ইবনু মাইমুন[২] বলেছেন,

|১| আহমাদ ১/১৬৫, ১৬৭, আল-বায়হাকী ১০/২৩২, আল-বাগাউই, শারহু সুন্নাহ ১২/২৫৯, আত-তিরমিযী ২৫১০।

|২| আত-তাকরীব বইতে আল-হাফিয বলেছেন, তার পুরো নাম ইবনু বাহ্‌র ইবনু সা'দ ইবনু রাম্মাহ আল-বালখী আবূ 'আলী আল-কাদী। তিনি নির্ভরযোগ্য বর্ণনকারী। তাকে অন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি সপ্তম পর্যায়ের বর্ণনাকারী। তিরমিযী তার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন।

"মূসা (আ.) এক ব্যক্তিকে আল্লাহর 'আর্‌শের কাছে দেখে ঈর্ষা করলেন। ঐ ব্যক্তির এরূপ মর্যাদার কারণ, জিজ্ঞেস করলে তাঁকে জানানো হলো, আল্লাহ অন্যান্য মানুষদের যে-আশিস দিয়েছেন তা নিয়ে সে হিংসা করে না। দুর্ধর্ষ গুজব রটিয়ে বেড়ায় না। বাবা-মাকে অমান্য করে না।'"

কেবল দুটো বেলায় হিংসা 'বৈধ'। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

"কেবল দুই লোকের বেলায় হিংসা করলে তা বৈধ। আল্লাহ যাকে কুর'আনের নেয়ামত দিয়েছেন। দিনরাতে সে কুর'আন তিলাওয়াত করে করে সালাত আদায় করে। আর আল্লাহ যাকে টাকাপয়সা দিয়েছেন—দিবানিশি যে সঠিক খাতে তা ব্যয় করে।"[১]

[১] বুখারী ২/১৩৪, ৯/৭৮, ১২৬। মুসলিম পৃষ্ঠা ৫৫৯।

আক্রোশ

কারও কথায় কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে সেটার যে এঁটো অংশ মনে থেকে যায়, তা-ই আক্রোশ। কারও ভালো কাজের সুখস্মৃতি যেমন মন ধরে রাখে, তেমনি অন্যের খারাপ কাজের দুখস্মৃতিও মন তার গভীরে রেখে দেয়।

'আবদুল্লাহ্ তার বাবা সাহাবি কা'বের কাছে শুনেছেন। তিনি তাবূকের লড়াইয়ে আল্লাহ্র রাসূলের ﷺ সাথে অংশগ্রহণ করেননি। তবে পরে তার আন্তরিক অনুশোচনা আল্লাহ্ কবুল করে নিয়েছিলেন। আর সেটা জানিয়ে কুর'আনে আয়াতও নাজিল হয়েছিল। সেই ঘটনার স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেছেন, "আমি মাসজিদে ঢুকলাম। অন্যান্যরা নবিজির ﷺ সাথে ছিলেন। তালহাহ্ ইবনু 'উবায়দুল্লাহ্ দৌড়ে আমার কাছে এলেন। করমর্দন করে আমাকে অভিবাদন জানালেন। আল্লাহ্র কসম, মুহাজিরদের মাঝে কেবল তিনিই আমার সাথে এমনটা করেছিলেন।" 'আবদুল্লাহ্ বলেছেন, "বাবা কখনো তালহার এই কাজটা ভোলেননি।"[১]

কেউ আপনার সাথে ভালো কাজ করলে তার কথা চিরদিন আপনার মনে থাকে। আবার কেউ যদি অবিচার করে তা হলে সেটাও মনে দাগ রেখে যায়। তবে ভালো হয় যদি এসব কালি মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন। ক্ষমা করে দিলে মনে আর কোনো বিদ্বেষের ছিটেফোঁটা থাকবে না।

ক্ষমা করার দুটো ধাপ আছে। প্রথমে আপনি ক্ষমা করার পুরস্কার জানবেন। দ্বিতীয়ত, আপনাকে যে আল্লাহ্ অন্যায় না করিয়ে বরং অন্যের অন্যায় ক্ষমা

---

[১] বুখারী ৬/৪, মুসলিম ৫৩।

করার মতো অবস্থায় রেখেছেন, সেজন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করুন। [কারণ, আজ যদি আপনি ভুল করতেন, আর আপনার প্রতি এমন বিদ্বেষ রাখা হতো, তা হলে ব্যাপারটা কেমন হতো?] যা আছে তা-ই নিয়ে খুশি থেকে আপনি ক্ষমা করার মহৎ গুণ অর্জন করতে পারবেন। অন্যের বিরুদ্ধে মনে যত ক্ষোভ আছে তা ফেলে দিলে এই অর্জন সহজে হবে।

তবে এরচেয়েও মোক্ষম ওষুধ আছে। আপনার যে-ক্ষতি হয়েছে তার কারণ, নিচের যেকোনো একটি:

- নিজের পাপের কারণে
- কোনো একটা পাপ মুছে দিতে
- আপনার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য, বা
- ধৈর্য পরীক্ষা করতে

এ চারটা জিনিস মাথায় রাখলে কেউ যত ক্ষতিই করুক, মনে আক্রোশ থাকবে না।

তবে এরচেয়েও অব্যর্থ ওষুধ আছে একটা।

আপনার সাথে যাকিছু হয়েছে তার সবকিছু মহান আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যলিপি থেকে হয়েছে—এটা বুঝলে মনে আর কখনো কারও প্রতি কোনো বিদ্বেষ ক্ষোভ আক্রোশ থাকতে পারে না।

রাগ

রাগ জিনিসটা মানুষের স্বাভাবিক বিষয়। এটা আছে বলেই নানা ক্ষতি থেকে সে নিজেকে বাঁচাতে পারে। কেউ তার ক্ষতি করলে প্রতিশোধ নিতে পারে। তবে রাগটা খুব বেশি হয়ে গেলে সমস্যা। অতিরিক্ত রাগ মানুষের বিবেকবোধকে নষ্ট করে ফেলে। সে তাল হারিয়ে ফেলে। তার জীবনযাপন হয় অসংযত। দেখা যায়, সে তখন এমন সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যার পরিণাম নিজেকেই ভোগ করতে হচ্ছে; যার উপর রাগ করা হয়েছে তাকে না।

রাগ একধরনের উত্তাপ। কোনো কিছু যখন কাউকে রাগের উস্কানি দেয় তখন তা গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কামনার রক্তকে টগবগিয়ে ফুটিয়ে দেয়। কখনো এর কারণে জ্বরও হতে পারে।

রাগের মূল কারণ, সাধারণত অহংকার। কারণ, কোনো মানুষ কখনো এমন কারও উপর রাগ করতে পারে না যার অবস্থান তার চেয়ে উঁচুতে।

এই রোগের ওষুধ হচ্ছে যেভাবে আছেন সেই অবস্থা বদলাবেন। যদি কথা বলতে থাকেন তা হলে চুপ হয়ে যাবেন। দাঁড়িয়ে থাকলে বসে পড়বেন। বসে থাকলে শুয়ে যাবেন। এভাবে অবস্থান বদলে ফেললে মাথা ঠান্ডা হবে।

রাগের মুহূর্তে যদি ঐ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে পারেন এবং যার উপর রাগ তার থেকে দূরে সরে যেতে পারেন, তা হলে তো আরও ভালো হয়। এর সাথে রাগ দমনের ফজিলত নিয়ে ভাবলেও কাজে দেবে। যারা রাগ দমন করতে পারে আল্লাহ নিজে তাদের তারিফ করেছেন। দেখুন আল্লাহ কী বলেছেন,

> যারা তাদের রাগ দমন করে, মানুষকে ক্ষমা করে—আল্লাহ্ এ ধরনের সৎকর্মশীলদের অত্যন্ত ভালোবাসেন। [আলি 'ইমরান, ৩:১৩৪]

হতে পারে হয়তো আপনার কোনো পাপের কারণে এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আর এগুলো সবই তো আল্লাহর পূর্বনির্ধারিত ভাগ্যলিপি। এসব মাথায় রাখলে রাগ-ক্রোধ সংবরণ আপনার জন্য সহজ হবে।

রাগ নিয়ে নবিজির ﷺ বাণীচিরন্তন

রাগ নিয়ে নবিজির ﷺ অনেক হাদীস আছে। আবু হুরায়রাহ রা. বলেছেন:

> এক লোক নবিজির ﷺ কাছে এসে বলল, "আমাকে উপদেশ দিন।"
>
> তিনি বললেন, "রাগ কোরো না।"
>
> লোকটা বারবার তাঁকে উপদেশ দেওয়ার অনুরোধ করতে লাগল। আর নবিজিও বারবার একই উত্তর দিলেন, "রেগে যেয়ো না।"[১]

অপর এক সময়ে নবিজি ﷺ বলেছেন,

> শক্তি খাটিয়ে যে মানুষকে পরাস্ত করে সে শক্তিশালী না। রাগের সময় যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সে-ই শক্তিশালী।[২]

বুখারী মুসলিম থেকে আরেকটি হাদীস:

> সুলাইমান ইবনু সার্দ রা. বলেছেন, "একদিন নবিজির ﷺ সাথে বসে আছি। হঠাৎ দেখি দুজন লোক একে অপরকে অভিশাপ দিচ্ছে। একজনের চেহারা তো রাগে ফুলেটুলে লাল হয়ে গেছে। গলার রগগুলোও ফুলে গেছে। এই অবস্থা দেখে নবিজি ﷺ বললেন,
>
> "আমি একটা কথা জানি। সে যদি এটা বলে তা হলে তার ভেতরের জিনিসটা চলে যাবে। সে যদি বলে, আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ-শাইত্বানির-রাজীম (আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই),[৩] তা হলে তার রাগ চলে যাবে।"

---

[১] বুখারী ৮/৩৫।

[২] বুখারী ৮/৩৪, মুসলিম ২০১৪।

[৩] বুখারী ৮/৩৫, মুসলিম ১০৯।

> কেউ একজন যেয়ে তাদের বলল, "নবিজি ﷺ তোমাদেরকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে বলেছেন।"
>
> এটা শুনে ঐ লোক বলল, "আমি কি পাগল?"

রাগ নিয়ে নবিজির ﷺ আরও একটি অমৃতবাণী:

> কেউ দাঁড়ানো অবস্থায় রেগে গেলে সে যেন বসে যায়। তারপরও যদি রাগ না যায় তা হলে সে যেন শুয়ে পড়ে।"[১]

আল-খাত্তাবি বলেছেন, "কেউ যখন দাঁড়িয়ে থাকে সে তখন কিছু একটা করে বসার মতো অবস্থায় থাকে। কিন্তু বসে পড়লে তার থেকে এ ধরনের আশঙ্কা কম থাকে।"

নবিজির ﷺ আরেকটি কথা:

> রেগে গেলে চুপ হয়ে যাও।[২]

আল-আহনাফ বলেছেন, "রাগের মাথায় অধৈর্য প্রকৃতির শয়তান মেজাজকে বশে রাখতে দেয় না।

অতিরিক্ত ক্রোধ

রাগে মাথায় রক্ত চড়ে গেলে যদি নিজেকে ঠান্ডা না করেন, তা হলে হয় নিজের ক্ষতি করবেন নয় যার উপর রাগ করেছেন তার। আর পরে দেখা যাবে ঠিকই সেটা নিয়ে মাথা কুটোচ্ছেন।

রাগের মাথায় কত লোক কত মানুষকে মেরে ফেলেছে। গায়ে হাত তুলেছে। বাচ্চাকাচ্চাকে মেরে হাত-পা পর্যন্ত ভেঙে ফেলেছে। পরে জীবনভর এগুলো নিয়ে হায় হায় করেছে। কেউ কেউ তো নিজেরই বারোটা বাজিয়েছে।

---

[১] আবূ দাউদ, আল-আদাব ৪/৪৭৮২, আহমাদ ৫/১৫২, শারহুস-সুন্নাহ ৩/১৬২, মাওয়ারিদুল-আযমান ১৯৭৩। হাদীসটির ব্যাপারে আল-বাগাউঈ বলেছেন, "তিনি তাকে প্রথমে বসতে বলেছেন। পরে শুয়ে পড়তে বলেছেন। রাগ অবস্থায় সে এটা না করলে পরে তার কাজ নিয়ে নিজেকে পস্তাতে হবে। কারণ, যে শুয়ে পড়বে তার পক্ষে কিছু একটা করে বসা বা দাঁড়ানো কাউকে আঘাত করা কঠিন হবে।

[২] মুসনাদ আহমাদ ১/৩২৯

এক লোক রাগের মাথায় এত জোরে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেছে যে মুখ দিয়ে রক্ত বের হয়ে সাথে সাথেই মারা গিয়েছে। আরেক লোক মেজাজ হারিয়ে অন্য লোককে ঘুষি মেরে নিজেই নিজের আঙুল ভেঙে ফেলেছে। যাকে ঘুষি মেরেছিল তার কিছুই হয়নি।

এই রোগ থেকে বাঁচতে চাইলে প্রথমে কল্পনা করুন রেগে গেলে আপনার চেহারার কী হাল হয়, আর শান্ত থাকলে কেমন থাকে। তখন বুঝবেন রাগ একধরনের পাগলামি। লাগামহীন অবস্থা। কোনোভাবেই যদি মনকে বাগে আনা সম্ভব না হয়, তা হলে নিজেকে নিজে শর্ত দিন: ঠিক আছে অবস্থান বদল করার পর যা করার করব (অর্থাৎ দাঁড়িয়ে থাকলে বসে)। তখন দেখা যাবে যা করতে যাচ্ছিলেন সেটা যে কী খারাপ একটা ব্যাপার হতো তা বুঝতে পারবেন। আর সেটা করতে পারবেন না।

রাগ চেপে রাখার ফজিলত

আমাদের আগেকার সৎলোকেরা যখন রেগে যেতেন তখন অন্যকে ক্ষমা করে দিতেন। রাগ দমন করে এর ফজিলত নিতেন।

তাদের কেউ কেউ ভাবতেন তাদের নিজেদের পাপের কারণে তাদের মনে রাগ ফিরে ফিরে আসছে। কেউ ভাবতেন এটা দিয়ে মহান আল্লাহ্ তাদের যাচাই করছেন। অন্যরা ভাবতেন যেসব কারণে মনে হিংসা জন্মায় তারা হয়তো সেসব কারণে রেগে যাচ্ছেন।

কুর’আনের আগে আল্লাহ যেসব ঐশীগ্রন্থ পাঠিয়েছিলেন, তার কোনো কোনোটায় আছে আল্লাহ্ বলেছেন,

> আদামসন্তান, রাগের সময় আমাকে স্মরণ করো। তা হলে তোমাদের পাপ করার সময় আমি তোমাদের স্মরণ রাখব। আমি যেসব ফেরেশতা দিয়ে ধ্বংস করি, তাদের দিয়ে তোমাদেরকে ধ্বংস করব না। কেউ যদি তোমাদের উপর অবিচার করে, তা হলে আমার সমর্থন নিয়ে তুষ্ট থাকো। কারণ, তোমাদের ব্যক্তিগত বিজয়ের চেয়ে আমার সমর্থন ভালো।

মাওরিক বলেছেন, "রাগের মাথায় আমি কখনো এমন কোনো কথা বলিনি, পরে শান্ত অবস্থায় যেটা নিয়ে আফসোস করতে হয়েছে।"

ইব্‌নু 'আওন কখনো রাগতেন না। কেউ তাকে রাগিয়ে দিলে বলতেন, "বারাকাল্লাহু ফীক (আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুক)!"

শাস্তি দেওয়ার আগে মাথা ঠান্ডা করে নেওয়া

কারও কাজকর্ম যদি শাস্তিযোগ্য অপরাধও হয়, তবুও মাথা গরম অবস্থায় শাস্তি দেবেন না। মাথা ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তা নাহলে যতটুকু অপরাধ ততটুকু শাস্তি না দিয়ে আপনার রাগের মাত্রা যত বেশি তত বড় শাস্তি দিয়ে দেবেন হয়তো।

একবার 'উমার ইবনু 'আবদুল-'আযীযের সামনে এক লোককে আনা হলো, তার উপর তিনি বেশ রেগে ছিলেন। তিনি তাকে বললেন, "তোমার উপর রেগে না থাকলে আমি তোমাকে ঠিকই মারতাম।" এরপর তিনি তাকে চলে যেতে দেন।

অহংকার

অহংকার মানে নিজেকে নিয়ে বড়াই আর অন্যকে তাচ্ছিল্য করা। বংশমর্যাদায়, সম্পদে, জ্ঞানে বা 'ইবাদাতে কেউ নিজের চেয়ে কম হলে, নিজেকে তখন তাদের চেয়ে বড় ভাবা থেকে অহংকারের শুরু। অহংকারের আলামত হচ্ছে যাদের উপর নিজেকে বড় ভাবেন তাদেরকে দেখে নাক সিঁটকানো, আস্ফালন করা, দর্প করা এবং অন্যরা যেন আপনার গুণকীর্তন করে তা ভালোবাসা।

এর উপশমের দুটো উপায় আছে:

- সংক্ষিপ্ত
- বিস্তারিত

সংক্ষিপ্ত উপায়টা আবার দু ধরনের:

- তাত্ত্বিক
- ব্যবহারিক

তাত্ত্বিকভাবে উপশম হয় অহংকারের খারাপ দিক নিয়ে বইপত্র পড়ে, এর নিকৃষ্টতার যৌক্তিক প্রমাণ জেনে। আর ব্যবহারিক উপশম হলো বিনয়ী লোকদের সাথে থেকে থেকে, তাদের জীবনকাহিনি শুনে শুনে।

বিস্তারিত উপায়টা হচ্ছে নিজের কমতি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা। নিজের টাকাপয়সা সম্পদ নিয়ে আপনার মনে যদি খুব অহংকার থাকে, তা হলে শুনুন:

শিগগিরই এটা আপনার কাছ থেকে চলে যাবে। কোনো জিনিস থেকে অনির্ভর থাকার মাঝেই গৌরব। তার প্রতি নির্ভরতা মোটেও গৌরবের কিছু না।

নিজের জ্ঞানের ভার দেখে মনে যদি খুব বড়াই হয়, তা হলে শুনুন: আপনার আগে আপনার চেও বহু জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। তারা এই পথের অগ্রপথিক। আর তাছাড়া জ্ঞান তো বরং মানুষকে অহংকার করতে নিষেধ করে। এটা নিজেই তা হলে আপনার এই খাসলতের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। আর বড়াইটা যদি হয় আমল নিয়ে, তা হলে বলব নিজের আমলকে পূর্ণতার চোখে দেখা খারাপ স্বভাব।

মনে অহংকার

আবূ সালামাহ বর্ণনা করেছেন:

> 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র একদিন ইবনু 'উমারের কাছে গেলেন। তিনি তখন মারওয়াহ পাহাড়ে ছিলেন। সেখান থেকে নেমে তারা কথা বললেন। কথাবার্তা শেষ করে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র যখন চলে গেলেন ইবনু 'উমার তখন বসে পড়লেন। তার চোখ সজল হয়ে পড়ল। কেউ একজন তাকে জিজ্ঞেস করল, "কাঁদছেন যে?"
>
> "একটু আগে উনি আমাকে বললেন তিনি নবিজিকে ﷺ বলতে শুনেছেন, 'মনের ভেতর বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকলেও আল্লাহ তাকে মুখের উপর জাহান্নামে ছুড়ে ফেলবেন।'"[১]

ইয়াস ইবনু সালামাহ رضي الله عنه বলেছেন যে তার বাবা বলেছেন,

> আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "একজন লোক নিজেকে নিয়ে এত বড়াই করবে যে তার নাম অহংকারীদের খাতায় উঠবে। এরপর তাদের যে-পরিণতি হবে তারও তা-ই হবে।[২]

ইবনু মাস'ঊদ رضي الله عنه বলেছেন:

---

[১] আল-বায়হাকী ১০/১৯১। আল-হায়সামী বলেছেন, এর বর্ণনাকারীরা বুখারী মুসলিমের হাদীসেও আছেন। তিনি এটা মাজমা'উয-যাওয়া'ইদ বইয়ে (১/৯৭) আহমাদ ও আত-তাবারানীকে আল-কাবিরে উল্লেখ করেছেন।

[২] আত-তিরমিযী ২০০০, আল-বাগাউঈ, শারহুস-সুন্নাহ ১৩/১৬৭। আদ-দায়লামী ৭৫৭৬। বর্ণনাসূত্রে 'উমার ইবনু রাশিদ আছেন। তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী।

> আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "যার মনে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"
>
> একজন জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু মানুষ তো তার পোশাকআশাক সুন্দর দেখতে পছন্দ করে। জুতোজোড়া সুন্দর দেখতে পছন্দ করে।"
>
> তিনি বললেন, "আল্লাহ্ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য ভালোবাসেন। অহংকার মানে সত্যকে ছুড়ে ফেলা। লোকজনদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা।"[১]

নিচের হাদীসটি আবূ হুরায়রাহ্ ও আবূ সা'ঈদ দুজনেই বলেছেন:

> আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "মহিমাময় গৌরবময় আল্লাহ্ বলেছেন, 'গর্ব আমার পোশাক। মর্যাদা আমার নিম্নবস্ত্র। এদুটোর কোনো একটা নিয়ে কেউ যদি আমার সাথে পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা করে, তা হলে আমি তাকে উচিত শাস্তি দেব।[২]

আল-খাত্তাবি এই হাদীসের ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেছেন,

> এর মানে গৌরব আর বড়ত্ব আল্লাহর দুটো বিশেষত্ব। এদুটো শুধুই তাঁর। কারও কোনো অংশ নেই এতে। কোনো সৃষ্টির মাঝে এদুটো থাকতে পারে না। কারণ, তাদের বৈশিষ্ট্য বিনয় আর অবনত থাকা। আল্লাহ্ এখানে পোশাক আর নিম্নবস্ত্রকে উদাহরণ হিসেবে বলেছেন। কেউ তার পোশাক ও নিম্নবস্ত্র অন্যের সাথে ভাগাভাগি করে না। তেমনি আল্লাহ্ও তার গৌরব ও বড়ত্ব অন্যের সাথে ভাগাভাগি করেন না। আল্লাহ্ ভালো জানেন।

"বিন্দু পরিমাণ অহংকার"-এর হাদীস নিয়ে আল-খাত্তাবি বলেছেন,

> "মনে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকলেও কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না"—এই কথার দুটো অর্থ হতে পারে।
>
> ১. এখানে অহংকার বলতে অবিশ্বাস বা কুফ্‌রের অহংকার বোঝানো হচ্ছে, এবং
>
> ২. আল্লাহ্ যাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তিনি তাদের মন থেকে অহংকার উধাও করে দেন।

---

[১] মুসলিম, কিতাবুল-বির্‌র্ ওয়াল-সিলাহ (ধার্মিকতা, ভালো আচরণ ও আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রাখা)। হাদীস নং ১৩৬।

[২] মুসলিম (১/৯৩)

'মানুষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে'—এর মানে তাদেরকে নিচু চোখে দেখা। নাক সিটকানো।

আল-হাসান বলেছেন,

আপনারা জানেন, লোকজন কাউকে কাউকে নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করে। তাকে বলে আরেহ আপনি তো এই। আপনি সেই। সেই লোক তখন আত্মতৃপ্তিতে ভুগে চুপচাপ বসে থাকে। নির্বোধ লোকেরা মনে করে সে আসলেও ওরকম। আবার কেউ কেউ [অহংকারের কারণে] স্বাভাবিকভাবে হাঁটে না। ভারিক্কি চালে হাঁটে।

হামবড়া ভাব

নিজের প্রেমে অন্ধ হওয়া থেকে হামবড়া ভাব তৈরি হয়। কেউ যখন কারও প্রেমে পাগল হয়, তার দোষক্রুটি আর তখন চোখে পড়ে না। সেগুলোকে দোষ বলেও মনে হয় না। বরং প্রেমিক সেগুলোকে নিখুঁত হিসেবে দেখে।

হামবড়া ভাবের পরিণাম হলো যে-জিনিসটার কারণে তার মধ্যে এমন চিন্তা এসেছে একসময় সে সেটাকই তীব্র ঘৃণা করতে শুরু করে। কারণ, কোনো জিনিস নিয়ে কেউ যখন নিজেকে খুব 'হনু' ভাবা শুরু করে, সে বিষয়ে সে আর তখন এগোতে পারে না। বরং সে তখন অন্যের ভুল ধরতে ব্যস্ত থাকে।

আপনাকে যদি এই অসুখে পেয়ে বসে তা হলে নিজের ভুলের ব্যাপারে সজাগ হোন। অসুখ কেটে যাবে। এ ব্যাপারে আগেও কথা বলেছি। অন্যের কাছে নিজের ভুলক্রুটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করুন। এই রোগে আগে যারা ভুগেছে তাদের পরিণতির কথা চিন্তা করুন।

কোনো 'আলিম বা বিদ্বান ব্যক্তির মধ্যে যদি নিজের জ্ঞান নিয়ে গরিমা থাকে তা হলে তিনি আগেকার জমানার 'আলিমদের জীবনী পড়বেন। নিজের দুনিয়াবিমুখতা নিয়ে কারও মধ্যে যদি 'হনু'ভাব আসে তা হলে চলে যাওয়া সময়ের অন্যান্য দুনিয়াবিমুখদের জীবনী পড়বেন। তা হলে দেখা যাবে তার মধ্য থেকে হামবড়া ভাব চলে গেছে।

আমি বুঝি না, মানুষের মাঝে কীভাবে নিজেকে নিয়ে গরিমা ভাব চলে আসে? ইমাম আহমাদ দশ লাখ হাদীস মুখস্থ জানতেন। কাহমাস ইবনুল-হাসান

দিনে তিনবার কুর'আন আগাগোড়া পড়ে শেষ করতেন। সালমান আত-তায়মী চল্লিশ বছর ধরে এক উদূতে 'ইশা' আর ফাজ্‌র আদায় করেছেন। কেউ বলতে পারবে না তারা কখনো এগুলো নিয়ে একদিনও দেমাগ দেখিয়েছেন।

এসব মানুষের জীবনের সাথে নিজেকে তুলনা করলে দেখা যাবে তার অবস্থা ঐ ব্যক্তির মতো যার হাতে আছে মাত্র এক টাকা। অথচ এটা নিয়েই সে গদগদ। সে জানেই না যে পৃথিবীতে এমন বহু বহু মানুষ আছেন যাদের কাছে আছে লাখ লাখ টাকা।

ইবরাহীম আল-খাওয়াস বলেছেন, "আত্মগরিমা নিজের সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবগত হওয়ার ব্যাপারে অন্তরায়।"

অন্য এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছিলেন, "আত্মগরিমা মানুষের বোধবুদ্ধির অন্যতম শত্রু। নানা আসরে নিজের গরিমা দেখাতে থাকলে তা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।"

লোক-দেখানি কাজকারবার

আল্লাহকে যে সত্যি সত্যি চেনে সে তার সব কাজে তাঁর প্রতি আন্তরিকতা বজায় রেখে করবে। স্রষ্টার ব্যাপারে মানুষের যখন জ্ঞানের ঘাটতি থাকে, আল্লাহকে যেভাবে মর্যাদা দেওয়া উচিত সেভাবে যখন দেয় না, মানুষ যখন ভেতরে ভেতরে অন্য মানুষের শ্রদ্ধা চায়, অন্যের মুখে নিজের তারিফ শুনতে চায়, তখন রিয়া' (লোক-দেখানি স্বভাব) জন্ম নেয়।

এই অসুখের প্রকোপ একেকজনের বেলায় একেক রকম। কেউ শুধু অন্যের প্রশংসা চায়। কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির সঙ্গে মানুষের প্রশংসাও চায়। কেউ-বা আবার লোকের তারিফটারিফ একেবারেই চায় না, কিন্তু যখন লোকজন দেখে সে কোনো ভালো কাজ করছে, সে তখন প্রশংসা পেতে কাজটা আরও ভালোভাবে করে। এক্ষেত্রে ভালো কাজটা যেন মসৃণ ত্বকে ঘায়ের মতো।

এই রোগের সাধারণ ওষুধ হচ্ছে আল্লাহকে খুব ভালো করে জানুন। তাঁকে জানলে দেখবেন সব কাজ শুধু তাঁর জন্যই করছেন। অন্য কারও প্রশংসা পেলেন কিনা সে কথা ঘুণাক্ষরেও মাথায় আসবে না। নিজেকে সব সময় বিনয়াবনত 'ইবাদাতকারীদের কাতারে দেখতে ইচ্ছে করবে; প্রশংসিতদের সারিতে না। যে আল্লাহকে চেনে সে জানে, পুরস্কার শুধু আন্তরিক কাজের জন্যই পাওয়া যায়। এজন্য সে পণ্ডশ্রমের ক্লান্তি থেকে নিজেকে বাঁচাতে চাইবে।

রিয়া' বা লোক-দেখানি কাজের শাস্তি খুব ভয়াবহ। নিয়্যাতে গড়বড় থাকলে সেই কাজের কোনো প্রতিদান আল্লাহর কাছে নেই। নবিজি ﷺ বলেছেন,

প্রত্যেক কাজ নিয়্যাত অনুসারে। মানুষ তার নিয়্যাত অনুযায়ী পুরস্কৃত হবে।[১]

আবূ মূসা ﷺ বলেছেন, একবার এক লোক নবিজির ﷺ কাছে এসে বলল,

"আল্লাহর রাসূল, কেউ যদি লড়াইয়ের ময়দানে সাহস, উৎসাহ আর ভণ্ডামির কারণে লড়াই করে, তা হলে এগুলোর কোনটাকে আল্লাহর পথে লড়াই করেছে বলে বিবেচনা করা হবে?"

তিনি বললেন, "যে আল্লাহর বাণী সুউচ্চ করার জন্য লড়াই করবে, কেবল তারটাই আল্লাহর পথে হয়েছে বলে বিবেচনা করা হবে।"[২]

নাতিল আশামী একদিন আবু হুরাইরাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন,

"শাইখ, আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছ থেকে শুনেছেন এরকম একটা হাদীস বলুন না।"

তিনি বললেন, "আল্লাহর রাসূলকে ﷺ আমি বলতে শুনেছি, 'বিচারদিনে যাদের ব্যাপারে ফায়সালা করা হবে তাদের মধ্যে শহিদেরা প্রথম দিকে থাকবে। তাকে সামনে আনা হবে। আল্লাহ তখন তাকে দেওয়া অনুগ্রহগুলো নিজে থেকে বলতে বলবেন। সে তখন বলা শুরু করবে। এরপর আল্লাহ বলবেন:

—(এসব অনুগ্রহের বিনিময়ে) তুমি কী করেছ?

— শহিদ হওয়া পর্যন্ত আমি আপনার পথে লড়াই করেছি।

— না। তুমি মিথ্যা কথা বললে। লোকে তোমাকে 'বীর লড়াকু' বলবে এজন্য তুমি লড়াই করেছ। আর তোমাকে তা লোকেরা বলেছেও।

এরপর তার বিরুদ্ধে ফায়সালা হবে। মুখ ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে তাকে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে ছুড়ে ফেলা হবে।

এরপর এমন এক লোককে আনা হবে যে জ্ঞান অর্জন করেছে। প্রচার করেছে। কুর'আন তিলাওয়াত করেছে। তাকে সামনে দাঁড় করানো হবে। আল্লাহ তখন তাকে দেওয়া অনুগ্রহগুলো নিজে থেকে বলতে বলবেন। সে তখন বলা শুরু করবে। এরপর আল্লাহ বলবেন:

— (এসব অনুগ্রহের বিনিময়ে) তুমি কী করেছ?

---

[১] বুখারী ১/২, ৮/১৭৫, ৯/২৯। মুসলিম, কিতাবুল-ইমারাহ, হাদীস নং ১৫৫।

[২] বুখারী ১/৪৩, ৪/২৫, ১০৫, ৯/১৬৬। মুসলিম, কিতাবুল-ইমারাহ, হাদীস নং ১৪৯-১৫০, ১৫১।

> — আমি জ্ঞান অর্জন করেছি। প্রচার করেছি। আপনার সন্তুষ্টির আশায় কুর'আন তিলাওয়াত করেছি।
>
> — না। তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি জ্ঞান অর্জন করেছ যাতে লোকে তোমাকে 'আলিম (জ্ঞানী) বলে। কুর'আন তিলাওয়াত করেছ যাতে লোকে তোমাকে ক্বারী (তিলাওয়াতকারী) বলে। আর তোমাকে এগুলো বলাও হয়েছে।
>
> এরপর তার বিরুদ্ধে ফায়সালা হবে। মুখ হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে তাকে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে ছুড়ে ফেলা হবে।
>
> এরপর এমন এক লোককে আনা হবে আল্লাহ্ যাকে বিশাল বিত্তশালী বানিয়েছিলেন। সব ধরনের সম্পদ দিয়েছিলেন। তাকে সামনে দাঁড় করানো হবে। আল্লাহ্ তখন তাকে দেওয়া অনুগ্রহগুলো নিজে থেকে বলতে বলবেন। সে তখন বলা শুরু করবে। এরপর আল্লাহ্ বলবেন:
>
> — (এসব অনুগ্রহের বিনিময়ে) তুমি কী করেছ?
>
> — আপনি যত যত উপায়ে সম্পদ ব্যয় করলে খুশি হবেন আমি তার সব কারণে টাকাপয়সা ব্যয় করেছি।
>
> — না। তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি এসব করেছ যাতে লোকে তোমাকে 'দানবীর' বলে। তোমাকে তা বলা হয়েছে।
>
> এরপর তার বিরুদ্ধে ফায়সালা হবে। মুখ হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে তাকে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে ছুড়ে ফেলা হবে।[১]

আবু হুরাইরাহ ﷺ বলেছেন, নবিজি ﷺ তাঁর প্রভুর বরাত দিয়ে বলেছেন আল্লাহ্ বলেছেন,

> "সঙ্গী হিসেবে আমিই সেরা। কাজেই যে আমার পাশে অন্যকে রেখে কোনো

---

[১] মুসলিম, কিতাবুল-ইমারাহ। হাদীস নং ১৫২।

বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে কা'ইল আশামী। কিন্তু এটা লেখার ভুল। তার শুদ্ধ নাম নাতিল আশ-শামী। সাহীহ্ মুসলিমের ব্যাখ্যবইতে আন-নাওয়াউঈ বলেছেন (৪/৫৬৮), "নাতিল ইবনু কাইস আল-হাযিমী আশা-শামী ফিলিস্তিনের অধিবাসী ছিলেন। তার বাবা সাহাবি ছিলেন। নাতিল ছিলেন তার গোত্রের প্রধান।"

হাদীসের ব্যাখ্যায় আন-নাওয়াউঈ বলেছেন, সাধারণভাবে এই হাদীসে স্রেফ আল্লাহর জন্য জিহাদকারীর গুণ তুলে ধরা হয়েছে। অনুরূপভাবে যারা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করবে, এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জ্ঞান অর্জন করবে তাদেরও প্রশংসা করা হয়েছে।

'ইবাদাত করবে, আমি সেটা থেকে মুক্ত। সে আমার সাথে যার ভাগ বসিয়েছে তাকে তার সাথেই ফেলে রাখা হবে।"[১]

মাহমূদ ইবনু লুবাইদ ﵁ বর্ণনা করেছেন, নবিজি ﷺ বলেছেন:

"তোমাদের জন্য ছোট শির্ক নিয়ে আমার সবচেয়ে ভয় হয়।"

তারা বলল, "আল্লাহর রাসূল, কী সেটা?"

"রিয়া'। বিচারদিনে সুমহান আল্লাহ মানুষকে যার যার কাজের প্রতিদান দিয়ে বলবেন, 'যাদেরকে দেখানোর জন্য কাজ করেছ তাদের কাছে যেয়ে দেখো কোনো পুরস্কার পাও কিনা।'"[২]

আবূ হাযিম বলেছেন,

কেউ যদি তার ও আল্লাহর মাঝে কিছু নষ্ট করে ফেলে, তা হলে আল্লাহ সেটা নষ্ট করে দেবেন। অনেকের জন্য কাজ করার চেয়ে একজনের জন্য কাজ করা সহজ। যদি আপনি শুধু আল্লাহর জন্য কাজ করেন, তা হলে বাকিরা এমনিতেই আপনার দিকে ফিরবে। কিন্তু যদি তা নষ্ট করে দেন তা হলে সবাই আপনাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করবে।[৩]

ইবনু তাওবাহ বলেছেন,

এক রাতে আমি ক্বারী আবূ বাক্র আল-আদামীকে স্বপ্নে দেখি। তিনি মারা গিয়েছিলেন। দেখলাম তিনি হাত বাড়িয়ে আছেন। তাকে বললাম, "আল্লাহ কী করলেন আপনার সাথে?"

---

[১] মুসলিম, কিতাবুয-যুহ্দ, হাদীস নং ৪৬। আহমাদ ২/৩০১। ইবনু খুযায়মাহ ৯৩৮। ইবনু মাজাহ, কিতাবুয-যুহ্দ ২১।

[২] আহমাদ ৫/৪২৮।

[৩] আবূ নু'আইম, আল-হিল্য়াহ ৩/২৩৯। অন্য একটি বর্ণনা, যার ধারাবাহিক বর্ণনাকারীগণ হলেন: আবূ হাযিম থেকে মুহাম্মাদ ইবনু মাতরাফ, তার থেকে 'আলী ইবনু 'আয়াশ, তার থেকে আহমাদ ইবনু হান্বাল। সেই বর্ণনায় আছে আবূ হাযিম বলেছেন, "যে আল্লাহ ও তার মাঝে যা আছে তা সংশোধন করে, আল্লাহ তার ও অন্য দাসের মাঝে সংশোধন করে দেন। আর সে যদি আল্লাহ ও তার মাঝে কিছু নষ্ট করে দেয়, তা হলে আল্লাহ তার ও অন্য দাসের মাঝে নষ্ট করে দেন। সবার মন রাখার চেয়ে একজনের মন রাখা সহজ। যদি আপনি আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখেন, তা হলে বাকিরা আপনার দিকে এমনিতেই ফিরবে। আর যদি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নষ্ট করেন, তা হলে বাকিরাও একসময় ঘৃণা করবে আপনাকে।

"তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে অনেক ভোগান্তির মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে।"

"কী বলেন! আপনার রাত জেগে তাহাজ্জুদ, ভালো ভালো কাজ, কুর'আন তিলাওয়াত এগুলোর কী হলো?

"এগুলোর চেয়ে খারাপ কিছু এখন আর আমার জন্য নেই। এগুলোর সব আমি দুনিয়ার জন্য করেছিলাম!"

"তো এখন কী অবস্থা আপনার?"

"সুমহান আল্লাহ আমাকে বলেছেন, 'যারা আশি বছরে পৌঁছে গেছে তাদেরকে আমি শাস্তি দেব না বলে আমার উপর ঠিক করেছি।'"

অতিরিক্ত চিন্তা

পাঠক, ভুলে যাওয়া কিছু মনে করতে কিংবা ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য চিন্তা তো করতেই হয়। কিন্তু ফায়দাহীন জিনিস নিয়ে চিন্তা করা ক্ষতিকর। আর সেটা যদি বেশি বেশি হয়, তা হলে তা শরীর-মন নষ্ট করে দেয়।

চিকিৎসকেরা বলেন, "শরীর ঠিক রাখার জন্য 'আলিমদের কখনো কখনো চিন্তাভাবনা থামানো উচিত।" আমার মতে, অর্জনযোগ্য কিছু নিয়ে কোনো বুদ্ধিমান লোকের চিন্তাভাবনা থামানো উচিত না। তবে কোনো সাধারণ লোক যদি খালীফাহ হওয়ার চিন্তা করে, আবূ হানীফাহ বা আশ-শাফি'ঈর মতো পণ্ডিত হওয়ার ইচ্ছা করে, বিশ্‌র আল-হাফি বা মা'রূফ আল-কারখীর মতো দুনিয়াবিমুখ হওয়ার কল্পনা করে, সাহাবি 'আবদুর-রাহমান ইবনু 'আওফের মতো সম্পদের স্বপ্ন দেখে—কিন্তু এগুলো কোনোটা অর্জনের জন্যই কাজ করে না, বসে বসে শুধু চিন্তাই করে, তা হলে তা শরীরের জন্য খারাপ।

আপনার জন্য যা অর্জন বাস্তবিক তা নিয়ে ভাবুন। ভালো ভালো কাজ থেকে কী হাসিল করতে পারবেন সেটা ভাবুন। শয়তানের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই নিয়েও চিন্তা করতে হবে আপনাকে।

কত পাপী তাদের পরিণাম নিয়ে ভেবে ভেবে পরে অনুশোচনা করেছে। কত রাজা-বাদশাহ দুনিয়ার ধোঁকাপূর্ণ জীবনের কথা ভেবে পরকালমুখী হয়েছে।

ভালো চিন্তাভাবনার কিছু নমুনা

ইবনু 'আব্বাস ﵄ বলেছেন, "সারা রাত বেখেয়ালে সালাত আদায় করার চেয়ে

ভাবনাচিন্তা মনোযোগসহ দু রাক'আত সালাত আদায় ভালো।"[1]

উম্মুদ-দারদা' ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "আবূদ-দারদা'র (তাঁর স্বামী) সেরা আমল কী?" তিনি বলেছিলেন, "চিন্তাভাবনা, শিক্ষাগ্রহণ।"[2]

ফাজ্‌রের সময় পর্যন্ত মালিক ইবনু দীনার দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেছেন। এরপর বলেছেন, "শেকলে বেঁধে গলায় লোহার বেড়ি পরিয়ে জাহান্নামের মানুষগুলোকে উষা পর্যন্ত আমার সামনে নিয়ে আসা হচ্ছিল।"

কোনো এক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন, "বারবার চিন্তাভাবনা করলে [মনের] অন্ধত্ব দূর হয়।"

|১| ইবনুল-মুবারাক, কিতাবুয-যুহ্‌দ, পৃষ্ঠা ৪০৩, মুহাম্মাদ ইব্‌নু নাস্‌র, কিতাবু কিয়ামুল-লাইল, পৃষ্ঠা ৬০।

|২| ইবনুল-মুবারাক, কিতাবুয-যুহ্‌দ, পৃষ্ঠা ৩০২। 'আওন ইবনু 'আবদুল্লাহ সূত্রে আছে উম্মুল-দারদা'কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "আবূল-দারদা'র নিয়মিত কাজ কী?" তিনি বলেছিলেন, "চিন্তাভাবনা।"

আবূ নু'আইম তার আল-হিল্‌য়াহ বইতে উল্লেখ করেছেন (১/২০৮), তিনি বলেছেন, "চিন্তাভাবনা ও মগ্নতা।" অন্য সূত্রে আছে আবূদ-দারদা' নিজে বলেছেন, "এক ঘণ্টা গভীর চিন্তাভাবনা করা সারারাত সালাত আদায়ের চেয়ে ভালো।"

অতিরিক্ত দুঃখ

পৃথিবীতে এমন একজন সজ্ঞান মানুষও নেই যার মনে দুঃখ নেই। অতীতের পাপ স্মরণ হলে সে কষ্ট পায়। সে তার আগের বেখেয়ালি অবস্থার কথা চিন্তা করে। জ্ঞানীগুণী মানুষেরা কী বলেছেন সেগুলো ভাবে। কেন যে আগে কথাগুলো মাথায় নেয়নি সেজন্য মন দুঃখ করে।

মালিক ইবনু দীনার বলেছেন, "কোনো হৃদয়ে যদি দুঃখ না থাকে, তা হলে সে হৃদয় নিঃসঙ্গ। ঠিক যেমন কোনো বাড়িতে কেউ না থাকলে সেটা জনশূন্য।"[১]

ইবরাহীম ইবনু 'ইসা'[২] বলেছেন, "আল-হাসানের চেয়ে দুখী মানুষ আমি দেখিনি। যখনই আমি তাকে দেখতাম, মনে হতো এই মাত্র যেন কোনো কষ্টে পড়েছেন।"

মালিক ইবনু দীনার অন্য আরেক জায়গায় বলেছেন, "দুনিয়ার জন্য যত আফসোস করবেন, বিচারদিনের ভয় মন থেকে ততটাই চলে যাবে।"

মনীষীদের কথা থেকে বুঝতে পারি দুঃখ বিষণ্ণতা ধার্মিকদের মধ্যেও থাকে। তবে অতিরিক্ত দুঃখকাতরতা এড়িয়ে চলতে হবে। ভালো যা কিছু ছুটে গিয়েছে তা নিয়ে আফসোস করতে হবে। এর প্রতিকারের উপায় আগের অধ্যায়ে বলেছি।

হাদীসে বলা আছে, "মু'মিনের বাকি জীবনটা খুব দামি। যা ছুটে গেছে সে তা শুধরাতে পারে।" যা শোধরানো যাবে না সেটা নিয়ে দুঃখ করে কোনো লাভ

[১] আবূ নু'আইম, আল-হিল্য়াহ, ২/৩৬০।

[২] ঐ, ১০/৩৯৩। আবূ নু'আইম বলেছেন, "দুনিয়াবিমুখ ইবরাহীম ইবনু ঈসা ছিলেন মা'রূফ আল-কারখীর সঙ্গী। তিনি আবূ দাঊদ আত-তায়ালিসী ও মুহাম্মাদ ইবনু আল-মুকরী'র মজলিশে বসতেন।

নেই। যদি ধর্মীয় বিষয় হয়, তা হলে আল্লাহর দয়া ও করুণার আশা রেখে তা পূরণ করে নিন। কিন্তু যদি বিষয়টা দুনিয়াবি হয়, তা হলে তা নিয়ে আফসোস করলে ক্ষতি ছাড়া আর কিছু বাড়াবে না। বুদ্ধিমান মানুষ হিসেবে এসব চিন্তা আপনার ছেড়ে দেওয়া উচিত।

দেখুন, যা চলে গেছে তা কি দুঃখ করলে ফিরে পাবেন? বরং এভাবে তো এক কষ্টের উপর আরেক কষ্ট চাপাচ্ছেন। নিজেকে এভাবে কষ্টের পাহাড়ে পিষে ফেলার কোনো মানে হয় না; বরং এই কষ্টগুলো একে একে কমিয়ে ঠেলে ফেলে দিতে হবে।

ইব্‌নু 'আম্‌র বলেছেন, "আল্লাহ্ যদি আপনার কাছ থেকে কিছু 'ফেরত' নেন, তা হলে এমন কিছু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ুন যা আপনাকে আর ওটার কথা মনে করাবে না।" তাছাড়া আল্লাহ্ যা ফেরত নেন, তার বদলে যা দেন তাতেও বিষয়টা সহজ হয়ে যায়। তবে যদি এমন কিছুই না হয় যাতে অবস্থাটা সহজ হচ্ছে, তা হলে মন থেকে কষ্ট দূর করার জন্য নিজেকেই একটু খাটতে হবে।

আরেকটা ব্যাপার। যে জিনিসটা বারবার মনে দুঃখ উথলে দেয় সেটা হলো আবেগ। বোধশক্তি কখনো এমন কিছুর স্থান দেয় না যা অদরকারি। কষ্টটা একসময় এমনিতেই সহজ হয়ে যাবে। পরে যেটা আসবেই সেটার দিকে নিজে থেকে আগেভাগে এগিয়ে যাওয়া ভালো না? এগিয়ে গেলে দেখবেন মন পুরোপুরি শান্ত হওয়ার আগে কষ্টের সময়টাতে স্বস্তি পাচ্ছেন।

দুঃখ-কষ্ট করার কোনো অর্থ নেই। বরং কষ্টের পুরস্কার নিয়ে ভাবুন। যারা আপনার চেয়ে আরও নিদারুণ কষ্টে আছেন তাদের কথা চিন্তা করুন। দেখবেন দুঃখ কষ্ট কোথায় হারিয়ে গেছে!

দুশ্চিন্তা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা

অতীতের কোনো দুর্ঘটনা থেকে দুশ্চিন্তা হয়। ভবিষ্যতের বিপদের চিন্তায় মানুষ উদ্বিগ্ন থাকে। অতীতের পাপ নিয়ে যদি দুশ্চিন্তা করেন, তা হলে সেটায় ফায়দা আছে। এর জন্য আপনি পুরস্কার পাবেন। আগামীতে করবেন এমন কোনো ভালো কাজ নিয়ে যদি উৎকণ্ঠিত থাকেন তাতেও কল্যাণ আছে। কিন্তু দুনিয়াবি কোনো হারানো জিনিস নিয়ে যদি দুশ্চিন্তা করেন, সেটা কি কখনো আর ফিরে আসবে? এই দুশ্চিন্তা কাজের কিছু না। এতে করে আপনি বরং কষ্টের উপর আরও কষ্ট চাপাচ্ছেন। এনিয়ে আগের অধ্যায়ে একবার বলেছি।

বিচক্ষণ হিসেবে আপনার উচিত হবে যাকিছু দুশ্চিন্তার কারণ, সেগুলো থেকে নিজেকে রক্ষা করা। খুব প্রিয় কিছু হারালে তা নিয়ে মন খচখচ করে। যার ভালোবাসার জিনিস বেশি তার দুশ্চিন্তাও সে অনুপাতে বেশি। যার কম তার দুশ্চিন্তাও সে-অনুপাতে কম।

কেউ কেউ বলতে পারেন, আমার তো এরকম ভালোবাসার কিছু নেই, তবুও তো কষ্ট হয়।

আপনি ঠিক বলেছেন। কিন্তু যে তার ভালোবাসার কিছু হারিয়েছে তার কষ্টের তুলনায় আপনার কষ্ট দশ ভাগের এক ভাগও না। আপনার যদি বাচ্চাকাচ্চা না হয়, এজন্য নিঃসন্দেহে আপনার মনে একটা দীর্ঘশ্বাস আছে। একটা কষ্ট আছে। কিন্তু এক মুহূর্ত চিন্তা করে দেখুন তো, যার কোনো সন্তান মারা গেছে আপনার শোক কি তার চেয়েও বেশি?

মানুষ যখন প্রিয় কোনো কিছুতে খুব অভ্যস্ত হয়ে যায়, বহুদিন সেটা কাছে পায় বা ব্যবহার করে, এরপর একদিন যখন তা হারায়, তখন বুকে যন্ত্রণার তীব্রতা খুব বেশি হয়। সারাজীবনের সব সুখ তিতকটা লাগে তখন।

ভালোবাসার জিনিসটা কিংবা মানুষটা নিজের অস্তিত্বের একটা অংশ হয়ে ওঠে। সুস্বাস্থ্যের মতোই যেন তা অপরিহার্য। এক দণ্ড এটা ছাড়া ভালো লাগে না। পাশে না থাকলে মন পোড়ে। কাছে থাকলে যত আনন্দ, দূরে গেলে তার চেয়েও বেশি কষ্ট। কারণ, মন ভাবে এর অধিকার কেবল তার।

বিচক্ষণ মানুষ হিসেবে আপনার প্রথম কাজ হবে নিজের আর ভালোবাসার মধ্যকার নৈকট্য খেয়াল করুন। বেসামাল হয়ে যাবেন না। হারানো জিনিসটা যদি আসলেই দরকারি কিছু হয়, তা হলে আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরে আস্থা রাখুন। আল্লাহ যা ঠিক করে রেখেছেন তা তো ঘটবেই।

আসলে এই জীবনটাই তো একদিক থেকে বলতে গেলে বেদনাময়। সব দালান একসময় ভেঙে পড়বে। আনন্দ-আড্ডা শেষ হয়ে যাবে। অস্থায়ী কিছুকে চিরস্থায়ীভাবে পেতে চাওয়ার মানে যার অস্তিত্ব নেই, তাকে খোঁজা। কাজেই জীবনের কাছে এমন দাবি অনুচিত।

এক কবি বলেছেন:

বেদনায় ভরা যে জীবন
তুমি সে জীবনে মুক্তি পেতে চাও
কষ্ট আর বেদনা থেকে।

কষ্টটাকে দ্বিগুণ ভাবলে পরে হালকা লাগবে। চালাকচতুর কুলিরা যা বহন করে তার উপর ভারী কিছু রাখে। এরপর কয়েক কদম আগানোর পরে সেটা ফেলে দেয়। তখন যা তারা বহন করে সেটা হালকা লাগে।

সমৃদ্ধির সময় যেকোনো দুর্ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। তা হলে পরে যদি কিছু ঘটেই যায়, তখন যা হারিয়েছেন তার চেয়ে যা রয়ে গেছে সেটা নিয়ে ভাবলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সহজ হবে। যেমন ধরুন, যদি টাকাপয়সা

খোয়া যায়, তা হলে যা বাকি আছে সেটার কথা ভাবলে ভালো লাগবে। চোখ উঠলে যদি ভাবেন, আমি তো অন্ধও হতে পারতাম, তা হলে এই অসুখ সহ্য করা সহজ হবে। বাকি সব দুঃখ-কষ্ট সহজে পার করার জন্য একই কথা খাটে।

কবি বলেছেন,

দূরদর্শীজন ভেবে রাখে দুঃখ-কষ্টের কথা
সেটা তার উপর পড়ার আগেই
যদি তা হঠাৎ পড়েই যায়
সে চমকে ওঠে না
সে তো আগে থেকেই তা ভেবে রেখেছিল
অবোধজন ভবিষ্যৎকে বিশ্বাস করে
ভুলে যায় তার আগে চলে যাওয়াদের কথা
যখন কোনো দুর্ঘটনায় পড়ে
তখন সে ধাক্কা খায়
যদি সে আগে থেকেই ভেবে রাখত
তা হলে ধৈর্য তাকে সাহসী হতে শেখাত

পূর্ববর্তী সৎলোকদের একজন বলেছেন, "এক নারীকে দেখলাম। তার তারুণ্য দেখে অবাক হলাম। বললাম, 'এই মুখ কখনো কোনো দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেনি।'"

সে বলল, "আপনার কথা ঠিক না। আমি যা ভোগ করেছি তা আর কারও হয়েছে বলে জানি না।

"আমার স্বামী একবার একটা ভেড়া জবাই করেছিলেন। আমার দুটো ছেলে ছিল। বড়টা ছোটটাকে বলল, 'চল তোকে দেখাই বাবা কীভাবে ভেড়াটাকে জবাই করেছে।' সে তখন তার ছোট ভাইকে জবাই করে।

"আমরা যখন তাকে দেখতে পেলাম সে তখন পালিয়ে গেল। আমার স্বামী তাকে খুঁজতে খুঁজতে মারা যায়।"

আমি বললাম, 'আপনি কীভাবে সেই কষ্ট সামাল দিলেন?'

সে বলল, "দুঃখের মাঝে যদি কোনো সহায় খুঁজে পেতাম, তা হলে তা কাজে লাগাতাম।"

শোকচিন্তা বেশি হলে পরে দুঃখ কষ্ট হয়। যা করলে শোক কাটিয়ে ওঠা যাবে সেটা করে একে তাড়াতে হবে। এই যেমন হালাল কোনো আনন্দ।

দুঃখ রক্তকে জমিয়ে ফেলে। আনন্দ একে উত্তপ্ত করে। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে আনন্দ বেদনা দুটোই ক্ষতিকর হতে পারে। মৃত্যুও হতে পারে যদি সীমা ছাড়িয়ে যায়।

অতিরিক্ত ভয়, মৃত্যু ভয়

অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে মানুষের মাঝে ভয় হয়। অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনার জন্য আগেভাগেই যে প্রস্তুতি নিয়ে রাখে সে-ই তো বুদ্ধিমান মানুষ। যা ঘটা অনিবার্য তা নিয়ে অহেতুক চিন্তা তারা করে না। কারণ, এ ধরনের চিন্তায় কোনো ফায়দা নেই।

অনেক ধার্মিকদের মনে আল্লাহর ভয় খুব বেড়ে গিয়েছিল। এতটাই যে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে হয়েছে তা কমিয়ে দেওয়ার জন্য। ভয় ব্যাপারটা চাবুকের মতো। একটা উটকে যদি লাগাতার চাবুকপেটা করতেই থাকেন, ওটা তা হলে মানসিক অশান্তিতে থাকবে। সময়ে সময়ে অলসতা দেখা দিলে তখন চাঙা করতে চাবুক ওঠাতে হয়।

সুফয়ান আস-সাওরীর সঙ্গে একবার এক যুবক কথা বলছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি আল্লাহকে একদম পুরোপুরি ভয় করতে চাও?"

"হ্যাঁ।"

"বোকা! তুমি যদি তাঁকে একদম পুরোপুরি ভয় করো তা হলে ফার্দ (ফরজ) কাজও ঠিকঠাকভাবে আদায় করতে পারবে না!।"[১]

---

[১] তিনি ইসলামের অন্যতম মহান এক ইমাম। তাকে হাদীস শাস্ত্রের গুরু নামে এক নামে চিনত সবাই। তাফসীরশাস্ত্রেও অগাধ দখল ছিল। ইমাম মালিক-সহ আরও অনেকের শিক্ষক ছিলেন তিনি। তিনি ৭৭৮ সালে মারা যান।

অতিরিক্ত ভয়

বুদ্ধিমান লোক কখনো অসুখে ভোগা নিয়ে অতিরিক্ত ভয় পাবে না। কারণ, জীবনের কোনো না কোনো সময়ে অসুখবিসুখ তো হবেই। যা ঘটবে তা নিয়ে ভয় করলে শুধু কষ্টই বাড়ে।

মৃত্যুভয় আর এ নিয়ে দুশ্চিন্তা—এ দুটো মন থেকে তাড়ানো সহজ নয়। তবে যা করলে কিছুটা সহজ হতে পারে তার কিছু উপায় বাতলে দিচ্ছি। মৃত্যু তো হবেই। ভয় করে কোনো লাভ হবে না। ভয় করলে শুধু ভয়ই বাড়বে। কেউ যখন মৃত্যুর কথা ভাবে তখন সেটা তার মনের আবেগকে ভীষণ আলোড়িত করে। এজন্য মনের ভেতর এর ছবি চিন্তা করা যাবে না ঘুণাক্ষরেও। মরলে তো একবারই মরবেন, বারবার না। তাই অহেতুক এর চিন্তা বাদ দিলে সহজ হবে।

দেখুন, আল্লাহ চাইলে এটা আপনার জন্য সহজ করে দিতে পারেন। তাছাড়া মৃত্যুর চেয়ে বরং মৃত্যুর পর যা হবে তা আরও বেশি রক্ত হিম করে দেয়। মৃত্যু আমাদের চিরকালীন নিবাসের সদর দরজা। এজন্য শুধু ভয়ের জন্য মৃত্যুভয় না, মৃত্যুর জন্য কাজ করা উচিত আমাদের।

এই সবুজ-শ্যামল দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবলে অনেকের আফসোস হয়। সত্যি কথা বলতে এই দুনিয়া কোনো তৃপ্তির জায়গা না। বরং এটা ছেড়ে যাওয়াতেই আনন্দ তৃপ্তি। এটা পাওয়ার জন্য কারও পাল্লা দেওয়া ঠিক না। বুদ্ধিমান মানুষ দুনিয়া ছেড়ে যেতে কেন কষ্ট পায় জানেন? আর কটা দিন সে ভালো ভালো কাজ করে যেতে পারল না বলে। আমাদের আগেকার সৎলোকেরা শুধু একারণেই মৃত্যুচিন্তায় কষ্ট পেতেন।

মৃত্যুশয্যায় সাহাবি মু'আয ইবনু জাবাল ﷺ বলেছিলেন,

> আল্লাহ, আপনি জানেন আমি এই দুনিয়ায় থাকতে ভালোবাসি না। এর প্রবহমান নদীর সৌন্দর্য কিংবা গাছগাছালির অরণ্যের টানে বেশিদিন বাঁচার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। বরং এই ভালোবাসা ছিল দাবদাহের দিনগুলোতে সিয়াম পালন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা 'ইবাদাতের কাজগুলো সয়ে যেতে। আপনার স্মরণে 'আলিমদের মাজলিসগুলোতে শরিক হতে।

মৃত্যুর সময়ে শয়তানের টোপ

মৃত্যুর সময়টা খুব যন্ত্রণাদায়ক। প্রচণ্ড কষ্টের। একদিকে ভালোবাসার সব জিনিস, প্রিয় মানুষ ছেড়ে যাওয়ার ব্যথা, অন্যদিকে মৃত্যুর বিভীষিকা, সম্পদের মায়া। শয়তান তাই এই সুযোগটার পূর্ণ 'সদ্ব্যবহার' করে।

সে কানপড়া দিতে শুরু করে: 'কী অবস্থা তোমার! কেন মারা যাচ্ছ? খুব কষ্ট লাগছে? তোমার স্ত্রী-সন্তান ছেড়ে কোথাকার কোন মাটির নিচে জায়গা হবে তোমার!'

এগুলো বলে বলে সে মানুষকে তার প্রভুর প্রতি বিদ্বেষী করার টোপ ফেলে। আল্লাহর নির্ধারিত নিয়তির প্রতি ঘৃণা জাগাতে চায়। তাকে দিয়ে আপত্তিকর কথাবার্তা বলায়। কিংবা উইল করার সময় দেখা যায় তাকে দিয়ে অন্যায় পক্ষপাত করাচ্ছে। বংশধরদের একজনের চেয়ে অন্যকে হিস্‌সার চেয়ে বেশি দিয়ে দিচ্ছে। এরকম আরও বহু বেইনসাফি কাজ করায়। এজন্য শয়তানের এই টোপ এড়ানোর উপায়, নিজেদের শুদ্ধ করার পন্থা জানা খুব খুব জরুরি।

আবূ আল-ইউস্‌র ﵁ বলেছেন নবিজি ﷺ একটা দু'আ প্রায়ই করতেন:

> أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت
>
> আ'উযু বিকা আন য়াতাখাব্বাত্বনীশ-শাইত্বানু 'ইনদাল-মাওত।
>
> (আল্লাহ) আপনার কাছে আমি মৃত্যুর সময় শয়তানের ধোঁকা থেকে আশ্রয় চাই।[১]

---

[১] আবূ দাউদ ১৫৫২-১৫৫৩। আন-নাসা'ঈ (৮/২৮৩) আবূ আয়্যুবের মুক্ত দাস-সূত্রে আবূল-ইউস্‌র থেকে বলেছেন, নবিজি ﷺ এই বলে দু'আ করতেন, "আল্লাহ, আমি আপনার কাছে ভূমিধসে চাপা পড়ে মরা থেকে, ডুবে মরা থেকে, আগুনে পুড়ে মরা থেকে, জরাগ্রস্ত হয়ে মরা থেকে আশ্রয় চাই। মৃত্যুর সময় শয়তানের ফাঁদ থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই। জিহাদরত অবস্থায় পালিয়ে যাওয়া থেকে আশ্রয় চাই। বিষের ছলে মরে যাওয়া থেকেও আশ্রয় চাই।"

আল-খাত্তাবী বলেছেন, "মৃত্যুর সময় শয়তানের ধোঁকা তিনি একারণে আশ্রয় চাইতেন, যাতে দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় শয়তান তাকে পাকড়াও করতে না পারে। তাওবাহ করা থেকে বাধা দিতে না পারে। নিজের কাজকর্ম সংশোধন করতে বাধা দিতে না পারে। আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ না করতে পারে। মৃত্যুকে ঘৃণা করাতে না পারে। এই দুনিয়ার জন্য আফসোস না করায়। নাহলে পরকালের পথযাত্রায় তিনি আল্লাহর বিধিতে অসন্তুষ্ট হয়ে পড়বেন। তার শেষ পরিণতি হবে অশুভ। আল্লাহর উপর নাখোশ অবস্থায় তিনি তাঁর সামনে দাঁড়াবেন।

অন্তিম সেই সময়ে শয়তান তার অনুচরদের বলে, "এই মরণের সময় যদি ওকে ভুল পথে নিতে না পারো, তা হলে আর জীবনেও পারবে না।"

কঠিন এই পরীক্ষায় উতরানোর উপায় হচ্ছে সুস্থ অবস্থায় আল্লাহর ব্যাপারে সচেতন থাকুন। তা হলে কঠিন সময়ে আল্লাহ 'নিজে' আপনাকে হেফাজত করবেন। আপনার চিন্তাচেতনায় যদি সব সময় আল্লাহকে স্থান দেন, তা হলে তিনি আপনার অঙ্গপ্রতঙ্গকে আজেবাজে কাজে জড়িয়ে পড়া থেকে রক্ষা করবেন। এই প্রসঙ্গেই নবিজি ﷺ বলেছেন,

> আল্লাহকে স্মরণ রাখো। তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন। আল্লাহকে স্মরণ রাখো, তোমার সামনে তাঁকে খুঁজে পাবে। ভালো সময়ে যদি তাঁকে চেনো, তা হলে তোমার কষ্টের সময়েও তিনি তোমাকে চিনবেন।[১]

ইউনুস নবির কাহিনি আপনাদের অনেকের মনে থাকার কথা। আল্লাহর শান্তি ঝরুক তার উপর। দুঃসহনীয় কষ্ট থেকে শুধু ভালো কাজের বদৌলতে তিনি উদ্ধার পেয়েছিলেন। সেই ঘটনার প্রসঙ্গে কুর'আনে আল্লাহ বলেছেন,

> "সে যদি আল্লাহর গুণগানকারী দাস না হতো, তা হলে কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত সে ওভাবেই (মাছের) পেটে থেকে যেত।
>
> [আস-সাফফাত, ৩৭:১৪৩-১৪৪]

অন্যদিকে ফিরাউন যখন অথৈ পানিতে ডুবে মরছিল, কোনো ভালো কাজ তার ঝুলিতে ছিল না যার বিনিময়ে সে উদ্ধার পেতে পারে। তাকে তখন বলা হয়েছিল:

"বলা হয় মৃত্যুর সময় শয়তান সবচেয়ে কঠিন চালটা চালে। সে তার অনুচরদের বলে, 'ধরো একে! আজ যদি না পারো আর কখনো একে ধরতে পারবে না।'

"আমরা আল্লাহর কাছে শয়তানের খারাপি থেকে আশ্রয় চাই। তাঁর কাছে মৃত্যুর সময় করুণা চাই। শুভপরিণতি চাই।"

[১] আত-তিরমিযী ২৫১৬। হাদীসটি তার মতে হাসান সাহীহ। আরও বর্ণনা করেছেন আহমাদ ১/৩০৭-৩০৮। আল-বায়হাকী, শু'বুল-ঈমান এবং আল-আসমা' ওয়াস-সিফাত পৃষ্ঠা ৭৬। আরও দেখুন দুরারুল-মানসূর ১/৬৬। তাফসীর ইবনু কাসীর ৭/৯১।

> "এখন বিশ্বাস করলে! অথচ আগে মুখ ফিরিয়ে ছিলে। তখন তো ছিলে দুষ্কৃতিকারী।" [ইউনুস, ১০:৯১]

দুনিয়াবিমুখ মনীষী 'আবদুস-সামাদ মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন, "মালিক! এই মুহূর্তটির জন্যই আপনার দয়াকে জমিয়ে রেখেছিলাম। সুস্বাস্থ্যের সময় যে বেখবর থাকবে, অসুসস্থ সময়ে তাকে পাত্তা দেওয়া হবে না।"

বর্ণিত আছে কোনো এক সাহাবি এক বুড়ো লোককে ভিক্ষা করতে দেখে বলেছিলেন, "যুবক বয়সে আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে সে বেখবর ছিল। এজন্য আজ বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহ তাকে উপেক্ষা করছেন।"

মৃত্যুযন্ত্রণার কঠিন সময়টা পার করতে নিজেকে উৎসাহ দিয়ে যান। এই যন্ত্রণা ক্ষণিকের। শিগগিরই এর অবসান ঘটবে। এরপর পূর্ণ শান্তি। নবিজি ﷺ বলেছেন,

> "আজকের পর থেকে তোমার বাবাকে আর কোনো যন্ত্রণা ছুঁতে পারবে না।"[১]

আবূ বাক্‌র্ ইবনু 'আয়্যাশ মৃত্যুর সময়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছেন, "আশিটি রামাদান যাঁর জন্য সিয়াম পালন করেছি, আজ এই সময়ে আমি কি তাঁর কাছে প্রত্যাশা রাখব না!"

আল-মু'তামির ইবনু সুলাইমান বলেছেন, "[মৃত্যুর সময়] আমার বাবা আমাকে বলেছেন, 'বাবা, আমাকে এরকম কিছু হাদীস শোনাও যেখানে আল্লাহর ছাড়ের কথা বলা আছে! আমি চাই যখন আল্লাহর সাথে দেখা হবে তখন যেন ভালো আশা নিয়ে দেখা করতে পারি।"

একজন বিশ্বাসী তাই ভয়কে ঝেটিয়ে বিদায় করবে। ঠিক যেমন একজন উটচালক মরুভূমির দুর্গম পথ পাড়ি দিতে তার উটকে শোধায়:

তোমার জন্য সুখবর!
কাল তুমি দেখতে পাবে ঘন অরণ্য আর পর্বত

[১] ইব্‌নু মাজাহ ১৬২৯।

নবিজি ﷺ বলেছেন,

> আল্লাহ বলেছেন, “আমার দাস আমাকে যেমন ভাবে আমি তেমন।”[১]

জাবির বলেছেন, “আল্লাহর রাসূলকে মৃত্যুর তিন দিন আগে বলতে শুনেছি,

> “আল্লাহর প্রতি সুধারণা না রেখে মৃত্যুবরণ কোরো না।”[২]

আল-ফুদাইল ইবনু 'ইয়াদ বলেছেন, “এমনিতে তো ভয় আশার চেয়ে ভালো। কিন্তু মৃত্যুর সময় আশা রাখাটা ভালো।”

তিনি ঠিকই বলেছেন। ভয় অলস মানুষকে চাবুকের মতো তাড়া করে ফেরে। উট কাহিল হয়ে পড়লে আমাদেরও কিছুটা ছাড় দিতে হবে।

কেউ যদি জিজ্ঞেস করেন মৃত্যুর সময় খালীফাহ 'উমার ইবনু 'আবদুল-আযীযের ভয় কেন অত ভীষণ ছিল, তা হলে বলব, দায়িত্বের প্রতি পরম নিষ্ঠা থেকে তার মনে এই ভয় এসেছিল। মনের গহিনে মানুষের অধিকার পূরণে সারাক্ষণ একটা তাগাদা ছিল তার। তিনি বলতেন, “এই নেতৃত্বে আমার বড় ভয়!” তিনি তার কথায়কাজে সৎ ছিলেন।

ইব্‌নু 'আব্বাস তাকে যখন বললেন, “আমীরাল-মু'মিনীন, সুখবর নিন। আপনাকে নেতৃত্বের ভার দেওয়া হয়েছিল। আপনি তা ঠিকঠাক পালন করেছেন। শহিদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করছেন!”

তিনি তখন তাকে বলেছিলেন, “ইব্‌নু 'আব্বাস! আল্লাহর সামনে এই সাক্ষী দেবেন তো?”[৩]

---

[১] বুখারি, মুসলিম

[২] মুসলিম

[৩] আরেক সঠিক দিকনির্দেশিত খালীফাহ 'উমার ইবনুল-খাত্তাব যখন ছুড়িকাহত হয়ে মৃত্যুশয্যায়, ইবনু 'আব্বাস তখন তার ঘরে এলেন। তাকে বললেন, “সুখবর নিন আমীরাল-মু'মিনীন। লোকজন যখন অবিশ্বাস করেছিল আপনি তখন ইসলাম বরণ করেছিলেন। অন্যরা যখন নবিজিকে ﷺ ছেড়ে গিয়েছিল আপনি তখন তার পাশে থেকে লড়াই করেছেন। আপনার উপর খুশি থেকে তিনি মারা গেছেন। আপনার খিলাফাতের সময় লোকেরা দ্বিমত করেনি। শহিদ হিসেবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছেন আপনি।”

তীব্র কষ্ট

অসুস্থ রোগীর যদি কষ্ট খুব বাড়ে, তা হলে সেটা পুরস্কার সাওয়াব হিসেবে দেখা উচিত। আমাদের আগেকার সৎ লোকেরা অসুস্থ লোকের কষ্টের তীব্রতাকে পছন্দ করতেন। কারণ, এটা পাপ মুছে দেয়।

বর্ণিত আছে ইবরাহিম বলেছেন, "মৃত্যুর সময়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণাকে তারা পছন্দ করতেন।"

'উমার ইবনু 'আবদুল-'আযীয বলেছিলেন, "আমি চাই না মৃত্যুর ভীষণ কষ্ট আমার কমে যাক। একজন মুসলিমের পাপ মোচনের এটাই তো শেষ সুযোগ।"

তাওবাহ

যতক্ষণ হুঁশ থাকবে অসুস্থ রোগীকে ততক্ষণ তাওবাহ্ করে যেতে হবে। তা হলে সে আল্লাহর কাছে পরিশুদ্ধ অবস্থায় যেতে পারবে। ওসিয়তনামাও লিখে যেতে হবে। স্বামী বা স্ত্রী এবং সন্তানকে আল্লাহর ভরসায় রেখে যেতে হবে। কারণ, যারা ধার্মিক আল্লাহ্ তাদের সহায়তা করেন। হেফাজত করেন।

আশা রাখা

মৃত্যুপথযাত্রীকে শয়তান যদি খুব বেশি জ্বালাতন করে, মরে গেলে কী হবে কী হবে এসব মনে করিয়ে তাকে উত্যক্ত করতে থাকে, তা হলে তার জেনে রাখা উচিত জাহাজের সফরকারীরা নেমে গেলে জাহাজ পরিত্যক্ত হয়। মানুষ না। শারী'আহ্ বলেছে মৃত্যুর পর একজন বিশ্বাসী চিরআনন্দে বসবাস করবে। কাজেই যার বিশ্বাস ঈমান পোক্ত তার তো ভয় পাওয়ার কথা না। তার গন্তব্য তো

তিনি বললেন, "যা বললেন আবার বলুন তো!"

আমি আবার বললাম।

তিনি বললেন, "একমাত্র সত্য উপাস্য আল্লাহর কসম, পৃথিবীর সোনারুপোর সব যদি থাকত, তার বিনিময়ে আমি বিচারদিনের বিভীষিকা থেকে নিস্তার পেতে চাইতাম।" [মুসনাদ আহমাদ ১/৪৬, আল-বায়হাকী, ইসবাত 'আসাবুল-কাব্‌র]

ভালো জায়গায়। এখন যদি ঈমান শক্ত না থাকে তা হলে সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার অবশ্যই অনেক কারণ আছে।

নবিজি ﷺ বলেছেন,

> "মুসলিমের আত্মা তো পাখির মতো। যতক্ষণ না আল্লাহ ওটাকে কোনো মুসলিমের শরীরে ফেরত পাঠান ততক্ষণ জান্নাতের গাছে তা ঝুলে থাকে।"[১]

মৃত্যু নিয়ে এতগুলো কথার মূল কারণ ছিল আমরা যেন মৃত্যুকে ভয় করতে গিয়ে টালমাটাল হয়ে না পড়ি। তা না হলে শরীর নিঃশেষ হয়ে যাবে। আবার একেবারে ভয়ডরহীন হলেও চলবে না। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে যেতে হবে।

[১] বুখারি, আত-তারীখুল-কাবীর ৫/৩০৬, আল-হুমাইদী ৮৭৩, আত-তাবারানী, আল-কাবীর ১৯/৬৪।

খুশি

হঠাৎ খুশির ঝলকায় রক্তের উত্তপ্ত হয়ে যায়। সেটা শরীরের ক্ষতি করতে পারে। এমনকি মৃত্যুও হতে পারে, যদি সেটাকে প্রশমিত না করা হয়। খুশির কোনো কারণ, পেলে সেদিকে ধীরে ধীরে যাওয়া উচিত। ইউসুফ ('আলাইহিস-সালাম) নবির সাথে যখন তার ভাইয়ের দেখা হলো, সে তাকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার বাবা আছে?" তিনি তখন তার সাথে গড়িমসি করছিলেন, যাতে হঠাৎ আনন্দের সংবাদে সে চমকে না যায়।

খুশিটাও মাপমতো হতে হবে। ঠিক দুঃখের মতো। সীমাহীন খুশি খামখেয়ালিপনায় ডুবে থাকার আলামত। জ্ঞানবুদ্ধিওয়ালা মানুষের জন্য সীমাহীন উল্লাস অযৌক্তিক। আনন্দের জিনিসে মন উল্লাস করে বটে, কিন্তু যখন তার গন্তব্যের কথা মনে পড়ে, দিনশেষে কোথায় যাত্রা ফুরোবে সে কথা মাথায় আসে, তখন তার উল্লাস রং হারায়। খুশির খামখেয়ালিপনা মারাত্মক বেড়ে গেলে মানুষ মহোল্লাসে মাতে। বেপরোয়া হয়ে যায়। এজন্যই আল্লাহ্ বলেছেন,

"আল্লাহ্ উল্লাসকারীদের ভালোবাসেন না।" **[কাসাস, ২৮:৭৬]**

এই অসুখ থেকে মুক্তি পেতে অতীত পাপ আর ভবিষ্যৎ বিপদাপদ নিয়ে গভীরভাবে ভাবুন।

আল-হাসান আল-বাসরী বলেছেন, "মৃত্যু এই দুনিয়ার গোমর ফাঁস করে দিয়েছে। জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের জন্য এটা আর কোনো খুশির উপকরণ বাকি রাখেনি।"[১]

---

[১] আহমাদ ইবনু হান্‌বাল, আয-যুহ্‌দ, পৃষ্ঠা ৩১৬। ইবরাহীম ইবনু 'ঈসা আল-য়াশকারী সূত্রে।

আলসেমি

বেকার বসে থাকা, আরাম ভালো লাগা আর পরে থাকা কাজটার কঠিনতার চিন্তা থেকে আলস্য বাসা বাঁধে। আনাস ইবনু মালিক বলেছেন, নবিজি ﷺ হামেশা দু'আ করতেন:

> اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل
>
> আল্লাহুম্মা ইন্নি আ'উযু বিকা মিনাল-হাম্মি, ওয়াল-হুজনি, ওয়াল-'আজ্যি ওয়াল-কাসাল।
>
> আল্লাহ, আমি আপনার কাছে কষ্ট, দুশ্চিন্তা, বুড়ো বয়স আর অলসতা থেকে আশ্রয় চাই।[১]

সক্রিয় বিশ্বাসীদের ব্যাপারে নবিজি ﷺ বলেছেন,

> "দুর্বল মু'মিনের চেয়ে শক্তিশালী মু'মিন আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়।"[২]

সব সময় যাতে ফায়দা হবে তাতে লেগে থাকুন। আল্লাহর সাহায্য চান। হাল ছেড়ে বসে থাকবেন না। মুসিবতে পড়ে গেলে বলবেন না 'যদি ওটা করতাম তা হলে এটা হতো না।' বরং বলুন, 'আল্লাহ এটাই ভাগ্যলিপিতে লিখে রেখেছিলেন। তিনি যা চান তা-ই হয়।' 'যদি' শব্দটা শয়তানের দিকে যাওয়ার রাস্তা খুলে দেয়।

---

[১] বুখারী ৮/৯৮, মুসলিম পৃষ্ঠা ২০৭৯, ২০৮০, ২০৮৮।

[২] মুসলিম, কিতাবুল-কাদ্‌র ৩৪।

ইব্‌নু মাস‘ঊদ ﷺ বলেছেন, “দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কাজ না করে যে অলস বসে থাকে তাকে আমি প্রচণ্ড ঘৃণা করি।”[১] তিনি আরও বলেছেন, “দুনিয়ার শেষ সময়ে কিছু লোকের সেরা কাজ হবে বসে বসে অন্যের নিন্দা করা। এসব লোকের আরেক নাম কুঁড়ে।”

ইব্‌নু ‘আব্বাস ﷺ বলেছেন, “ঢিলেমি অলসতাকে বিয়ে করেছে। আর তারা জন্ম দিয়েছে দারিদ্রকে।”

মালিক ইবনু দীনার বলেছেন, “প্রত্যেক ভালো কাজের আগে বিপত্তি থাকে। যে তা সহ্য করবে সে আরাম পাবে। ভয় পেলে ফিরে আসতে হবে।”

সুফ্‌য়ান আস-সাওরী বলেছেন, “লোকজন দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়া ছেড়ে দিয়েছে। আমরা এখন বসে আছি অলস উটের পিঠে।”

অলসতার ওষুধ

আলসেমির ওষুধ হচ্ছে, নিজেকে তাগাদা দিন: বসে থাকলে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব না। নিন্দিত হতে হবে। পরে চলে যাওয়া সময় নিয়ে আফসোসের দহনে পুড়তে হবে নিজেকে। কোনো কর্মঠ লোকের সফলতা যখন চোখে পড়বে তখন এই আফসোস হবে আপনার সবচেয়ে কষ্টকর সাজা। জ্ঞানবুদ্ধিওয়ালা মানুষ অলসতার নেতিবাচক পরিণাম নিয়ে ভাবে। বেশিরভাগ সময়েই অলসতার পরিণামে পরে কপাল চাপড়াতে হয়।

যখন দেখবেন আপনার প্রতিবেশী মুনাফা নিয়ে ঘরে ফিরেছে আর আপনি বসে বসে অন্ন ধ্বংস করেছেন তখন কি আপনার খারাপ লাগবে না? কিংবা কেউ জ্ঞান অর্জনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে অথচ আপনি কিনা অলস বসে সময় নষ্ট করেছেন। তখন কি আপনার আফসোস হবে না? এদুটো কথা একারণেই বললাম যে, আরামে থাকার যে-মজা, ভালো কিছু ছুটে যাওয়ার ব্যথা তার চেয়ে অনেক বেশি।

---

[১] আবূ নু‘আইম, আল-হিল্‌য়াহ, ১/১৩০। য়াহ্‌য়া ইবনু ওয়াসাব সূত্রে।

আরাম আর আলসেমিতে যে জ্ঞান আহরণ করা যায় না এ ব্যাপারে কোনো সমঝদার মানুষ অমত করবেন না। যে কুঁড়েমির পরিণাম জানে সে তা এড়িয়ে চলবে। কঠোর পরিশ্রমের ফল যে জানে সে তার যাত্রাপথের নানা কষ্ট দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করবে। বুঝদার মানুষ জানে অনর্থক তাকে সৃষ্টি করা হয়নি। এই দুনিয়ায় সে একজন ভাড়াটে শ্রমিক বা ব্যবসায়ীর মতো।

দুনিয়াতে ঠিক কী পরিমাণ সময় থাকি আমরা? কিংবা কবরে? পরকালের অন্তহীন জীবনের তুলনায় এর ব্যাপ্তি এক মুহূর্তের চেয়ে বেশি কিছু না।

আলসেমি অসুখ থেকে উদ্ধার পেতে কর্মঠ উদ্যমী মানুষদের জীবনী পড়ুন। তাদের কাজকর্ম নিয়ে ভাবনাচিন্তা করুন। বীজ বপনের মৌসমে যে ঘরে বসে বসে তা দিয়ে ফসলকাটার মৌসুমে ঘরে ফসল তোলার স্বর্ণসুযোগ নষ্ট করে তাকে দেখে অবাক লাগে আমার।

ফারকাদ বলেছেন,

> কাজে নামার আগেই আপনি আরামের পোশাক গায়ে চাপিয়ে নিয়েছেন। শ্রমিকেরা কীভাবে কাজ করে সেটা কি খেয়াল করেছেন? ওরা কমদামি একটা পোশাক গায়ে জড়িয়ে কাজ শুরু করে। কাজ শেষ হলে পরে গোসল করে পরিষ্কার দুটো কাপড় পরে নেয়। আর আপনি কাজ ধরার আগেই আলসেমির পোশাক মুড়ে শুয়ে আছেন।[১]

---

[১] হিল্‌য়াতুল-আওলিয়া' ৩/৪৭। ইবনু শাওসাব সূত্রে।

নিজের দোষ শনাক্ত করা

মানুষ নিজেকে নিজে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। ভালোবাসার মানুষের খুঁত কি আর চোখে পড়ে? তবে কিছু কিছু লোক তাদের আত্মশুদ্ধির সংগ্রামে এতটাই দৃঢ়চেতা, তারা নিজেদেরকেই নিজেদের সবচেয়ে বড় শত্রু ভাবেন। যেকারণে তারা নিজদের দোষত্রুটি দেখতে পান।

ইয়াস ইবনু মু'আউইয়াহ বলেছেন, "যে নিজে তার দোষ জানে না সে বোকা।" তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, "আপনার দোষ কী?" তিনি বললেন, "বেশি কথা বলা।"

তবে ইবনু মু'আউইয়ার মতো নিজে নিজের খুঁত খুজে পাওয়াটা বেশ বিরল। মানুষ সাধারণত তাদের নিজেদের খুঁত গোপন করে রাখে। তবে অনেকেই আছেন যারা নিজেদের ভুলত্রুটি সম্পর্কে সজাগ। বুদ্ধিমান মানুষ নিজের সমস্যা নিজেই ধরতে পারেন। তবে গুপ্ত খুঁতগুলো ভয়ংকর। এগুলো শরীরের ভেতরে ভেতরে গোপনে বাসা-বাঁধা অসুখের মতো। ডাক্তার এগুলো ধরতে পারে না। সেজন্য ওষুধও দিতে পারে না। রোগের কোনো লক্ষণই যে তারা খুঁজে পান না, ওষুধ দেবেন কীভাবে? তাছাড়া মানুষের নিজের প্রতি ভালোবাসাও তার ভুলগুলোকে ভুল হিসেবে দেখায় না।

একজন কবি লিখেছেন,

তুষ্ট চোখ ভুল দেখে না
ভুল দেখে রুষ্ট চোখ

দুজন লোক হেঁটে হেঁটে আলাপ করছিলেন। যাবার সময় একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার ভুলক্রটির কথা বলুন তো ভাই।" অন্যজন জবাবে বললেন, "আমাকে বাদে আরেকজনকে জিজ্ঞেস করুন। আমি আপনাকে সন্তুষ্টির চোখে দেখেছি।"

জিজ্ঞেস করতে পারেন, খুঁত যদি গোপন থাকে, আর মানুষ সেটাকে খুঁত হিসেবে না ই দেখে, তা হলে শনাক্ত করব কীভাবে? এর সাতটি উপায় আছে।

প্রথম উপায়: নিজের বন্ধুবান্ধব বা চেনাজানাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানীগুণী ও বিচক্ষণ লোককে নিজের দোষগুণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। তাকে জানান এটা আপনার ভালোর জন্যই। এরপর সে যখন আপনাকে একে একে তার দোষক্রটিগুলো বলবে, তখন তাতে মন কালো করা যাবে না। কষ্ট পাওয়া যাবে না। তা নাহলে সে আপনার ভুলক্রটি বলা বন্ধ করে দেবে। তাকে বলে দিতে হবে, "তুমি যদি আমার কিছু লুকাও তা হলে ভাবব তুমি ধোঁকাবাজ।"

দ্বিতীয় উপায়: প্রতিবেশি, ভাইবেরাদর, যাদের সাথে নিয়মিত দেখাসাক্ষাৎ হয় তাদের থেকে নিজের দোষগুণ জেনে নিন।

তৃতীয় উপায়: নিজের ব্যাপারে শত্রুদের মনোভাব জানাটাও বেশ কাজের হবে। শত্রু সব সময় আপনার ছিদ্র খোঁজে। এগুলো আমলে নিলে বন্ধুর চেয়ে বরং শত্রুর থেকেই বেশি লাভবান হবেন। শত্রু খুঁজে খুঁজে দোষ বের করে। আর বন্ধুরা তা লুকিয়ে রাখে।

চতুর্থ উপায়: নিজেকে অন্যের চোখে দেখুন। সেই চোখে যেটা ভালো লাগছে সেটা রেখে দেবেন। আর যেটা ভালো লাগছে না সেটা ছেড়ে দেবেন।

পঞ্চম উপায়: ভালো ও মন্দ চরিত্রের ফল আর পরিণাম নিয়ে ভাবুন। তা হলে ভালো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ফলে যে-ভালো ফল আসে সেটা যেমন জানবেন,তেমনি খারাপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিণাম কী হবে সেটাও তার ঠাহর হবে। নিজের ব্যাপারে খাঁটি ভাবনা বেশ শক্তিশালী।

ষষ্ঠ উপায়: শারী'আর পাল্লায় নিজের সব কাজগুলোকে মাপুন। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষদের থেকে আপনার বিভিন্ন কাজকারবারের ব্যাপারে মন্তব্য নিন। সুবিচারের পাল্লায় ওজন করুন। তা হলেই খারাপ আর ভালোর পার্থক্য চোখে পড়বে আপনার।

সপ্তম উপায়: যারা তাদের জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করেছেন সেসব মানুষের কাহিনি পড়ুন। তারপর তাদের কাজের সাথে নিজের কাজকর্মের তুলনা করুন। এতে করে খারাপ কাজ তো পরের কথা, নিজের ছোটখাটো অসংগতিগুলোকেই ভুল মনে হবে।

আমাকে দিয়ে হবে না

মনের ভেতর এ ধরনের চিন্তা যদি আপনার জন্মগত হয়, তা হলে এর কোনো প্রতিকার নেই। তবে যদি আশেপাশের মানুষদের সাথে থেকে থেকে এ ধরনের চিন্তা মনে ঠাঁই দিয়ে থাকেন, কিংবা এরকমটা ভাবতে ভাবতে একসময় নিজেকে এভাবেই ধরে নেন, তা হলে এর অসুখ সারানোর অনেক উপায় আছে। এই যেমন:

- হীনম্মন্য লোকদের এড়িয়ে চলুন
- তাদের ঘৃণা করুন
- উদ্যমী লোকদের সাথে থাকুন
- হীনমন্যতার পরিণাম, এ ধরনের লোকদের পরিণতি নিয়ে ভাবুন
- কর্মঠ, উদ্যমী লোকদের সফলতা নিয়ে ভাবুন

'আবদুস-সামাদ বলেছেন, "কঠোর পরিশ্রমের জন্য পরিচিত একজন লোক যখন মারা গেলেন, লোকজন তখনো বলাবলি করছিল, 'লোকটা আজকে মরেছে, কিন্তু চিরকাল বেঁচে থাকবে।' এ কথাটা আমাকে জাগিয়ে দিয়েছে।"

দেখুন উদ্যমী লোকেরা আপনার মতোই। মাটির উপাদান থেকে তাদের সৃষ্টি। তারাও মানুষ। নিষ্কর্মা লোকদের সাথে তাদের মূল ফারাক তারা আরামপ্রিয় নন। অলসতা তাদের পায়ে শেকল পরিয়ে বসিয়ে রাখেনি। হীনম্মন্য লোক ঘরে বসে থাকে। আর কর্মঠ লোকেরা কাজে নেমে পড়ে। ক্ষুদ্রচিন্তার এসব মানুষও যদি

গা ঝারা দিয়ে বাইরে পা ফেলে তা হলে সফলদের অবস্থানে তারাও একদিন পৌঁছে যাবে।

এক কবি বলেছেন, "কারও কোনো বৈশিষ্ট্য ভালো লাগলে তা অনুকরণ করুন। সেটা আপনারও হবে। দয়া ভালো আচরণের মতো বৈশিষ্ট্যগুলোর সংস্পর্শে এলে যে কেউ তা পেতে পারেন। এগুলোর মাঝে কোনো পর্দা নেই।"

আগেকার ধার্মিক লোকদের জীবনী পড়লে, তাদের সম্পর্কে জানলে দেখবেন, বেশিরভাগ আইনজ্ঞ, 'আলিম-বিদ্বান ছিলেন দাস। সমাজে তারা ছিলেন দুর্বল। ছোটখাটো কাজ করে জীবন চালাতেন। কিন্তু উঁচু স্বপ্ন তাদেরকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে।

নিজেকে যারা অকেজো মনে করেন—এমন মনোভাবের পরিণাম নিয়ে ভাবলে বুঝবেন অলসতা আপনার সবচেয়ে বড় শত্রু। কিন্তু এই শত্রুকেই আপনি লাই দিচ্ছেন। আরাম আলসেমিকে আপন করে নিয়েছেন। দুঃখ দুর্দশা তো পিছু নেবেই, সেই সাথে সুযোগ হারানোর আফসোস, মানুষের অশ্রদ্ধা অপমানের জ্বালাও তার চেয়ে কম হবে না।

অন্যদিকে, কর্মচঞ্চল লোকেরা অন্যদের থেকে সম্মান পায়। পরকালের আগে দুনিয়াতেই তাদের মর্যাদা আকাশ ছোঁয়। মুছে যায় তাদের কষ্টের তিক্ততা। যে কষ্ট সহ্য করে তাকে দেখলে মনে হয় সে যেন কখনো আরাম করতে জানে না। আর যে আরাম করে তাকে দেখলে মনে হয় সে যেন কখনো কষ্ট সহ্য করার কথা চিন্তাও করতে পারে না।

নবিজির ﷺ কাছ থেকে আনাস ইব্ন মালিক বর্ণনা করেছেন,

> জাহান্নামের এক লোককে, যে পৃথিবীতে সবধরনের সুখ ভোগ করেছে, বিচারদিনে তাকে সামনে আনা হবে। জাহান্নামে চোবানো হবে। তারপর আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, 'আদাম সন্তান, জীবনে কখনো ভালো কিছু দেখেছ? কখনো কোনো সুখ পেয়েছ?' সে বলবে, 'আল্লাহর কসম, না। কক্ষনো না।'
>
> এরপর জান্নাতি একজনকে, যে পৃথিবীতে সবচেয়ে কষ্টের জীবন পার করেছে, বিচারদিনে তাকে এনে জান্নাতে অবগাহন করানো হবে। এরপর আল্লাহ জিজ্ঞেস

> করবেন, 'আদাম-সন্তান, জীবনে কখনো কষ্ট দেখেছ? কখনো দুর্দশায় ছিলে?' সে বলবে, 'আল্লাহর কসম, না। কক্ষনো না।'

এই হাদীসের মানে হচ্ছে, কষ্টযাতনা পরিশ্রান্তি একদিন তো ফুরোবেই। থাকবে শুধু স্বস্তি। অন্যদিকে আরাম আয়েশ শেষ হয়ে যাবে। থাকবে শুধু অনুশোচনা। জীবন তো একটা মৌসুমের মতো। মৃত্যু ধেয়ে আসছে। ফসল এখনই ঘরে তুলতে হবে। এসব চিন্তার ছিটেফোঁটাই কুঁড়ে লোকের গা ঝাড়া দিয়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট।

মনের উপর লাগাম

প্রকৃতিগতভাবে মানুষের স্বভাব আচরণ ভালো। অসুখবিসুখ ভুলত্রুটি এগুলো বাইরে থেকে আসে। প্রত্যেক শিশু ফিতরাহ—মানে ভালো আচার-স্বভাব নিয়ে জন্মায়।

শৃঙ্খলার বিষয়টা বুদ্ধিজগতে কাজ করে। এজন্য গাধার বেলায় এটা কাজ করে না। বনের পশুকে বাচ্চা বয়সে যতই দেখভাল করা হোক, বড় হয়ে এটা শিকার করা ছাড়বে না।

প্রত্যেক মানুষের তিন ধরনের সামর্থ্য আছে:

- ভাষিক
- কামনা বাসনাগত
- বদরাগি

আল্লাহ যদি আপনাকে জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা দিয়ে থাকেন, তা হলে আপনার ভাষাগত দিকটা উন্নত করুন। ভাষার কারণেই প্রাণীজগতের উপর আপনার শ্রেষ্ঠত্ব। ফেরেশতাদের সাথে অভিন্ন এক গুণ এটা। বাকি দুটো সামর্থ্যের উপর একে আধিপত্য করতে দিন। যাতে এটা হয়ে ওঠে সওয়ারি। শরীর হলো ঘোড়া। ঘোড়ায় চড়ার কারণে সওয়ারি ওটার লাগাম ধরে রাখে। যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যায়। চাইলে জবাই করতে পারে। সেরকম ভাষিক দিকটাকেও বাকি দুটোকে চড়িয়ে খেতে দিন। প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হবে। অপ্রয়োজনে ছাড়তে হবে। যে তা করতে পারে সে-ই 'মানুষ' খেতাব পাওয়ার উপযুক্ত।

প্লেটো বলেছিলেন,

যার 'ভাষাগত সত্তা' বাকি সব সত্তার চয়ে শক্তিশালী, সে-ই প্রকৃত মানুষ। কামনা লাগাম ছাড়া হলে সে পশু হয়ে যায়। ওখানে বাঁধ না পড়লে জীবন হয় অসংযত। সে তার কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। সে তখন পশুর চেয়েও অধম হয়। কারণ, লাগামহীন জীবন পশুর স্বভাব। এরকমটা করে সে তার মনুষ্য-স্বভাবের বিরোধিতা করেছে।

যখন রাগ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়, তখন মানুষের চরিত্র বন্য জানোয়ারের মতো হয়।

একারণে তাকে তার মনটাকে পোষ মানাতে হবে। আর সেজন্য কামুক চিন্তাগুলো তাড়াতে হবে। রাগকে বশ করতে হবে। ভাষিক সামর্থ্যের অনুসরণ করতে হবে। যাতে সে ফেরেশতাদের মতো হয়। কামনা আর রাগের গোলাম না হয়।

কীভাবে মনে লাগাম পরাবেন?

কোমলভাবে নিজের এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় বদলে যেয়ে মনের উপর লাগাম পরানো যায়। রুক্ষসূক্ষ্ম হয়ে না। নরমভাবে। সাথে থাকতে হবে আশা আর ভয়ের সম্মিলন। এই লাগাম শক্ত থাকবে যদি,

- ভালো বন্ধুবান্ধব, সঙ্গীরা সাথে থাকে
- খারাপ মানুষদের সঙ্গ ছেড়ে দেন
- কুর'আন বুঝে পড়েন
- উপকারী গল্প-কাহিনি পড়েন
- জান্নাত-জাহান্নামের কথা ভাবেন এবং
- জ্ঞানীগুণী দুনিয়াবিমুখ মানুষদের জীবনী পড়েন।

আগেকার সময়ের ধার্মিকদের কেউ কেউ যখন মজাদার কোনো খাবার খেতে চাইতেন, তখন তারা নিজের সাথে পণ করতেন: আজকে রাতে যদি

তারা তাহাজ্জুদ পড়েন, তা হলে এই মজার খাবার খেয়ে নিজে নিজেকে পুরস্কার দেবেন।

একসময় যা মন চাইত তা-ই খেতেন সুফ্‌য়ান আস-সাওরী। পরে সকালে ঘুম থেকে উঠে বলতেন, "কৃষ্ণাঙ্গ লোকটি তার বাচ্চাকে খাইয়েছে!" মনের উপর যতক্ষণ না 'আলিমরা লাগাম পরাতে পারতেন, যতক্ষণ না একে বশ মানাতে পারতেন, ততক্ষণ তারা কোমলভাবে একে সামলাতেন।

মালিক ইবনু দীনারের এক প্রতিবেশী বলেছেন, "এক রাতে আমি শুনি তিনি বলছেন, 'তোমার তো এরকমই হওয়া উচিত!' পরের দিন আমি তাকে বললাম, 'আপনার বাসায় তো কেউ ছিল না। আপনি এ কথাটা কাকে বললেন?"

তিনি বললেন, "আমার মন কিছু রুটি খেতে চেয়েছিল। খুব পীড়াপীড়ি করছিল। তিনদিন নিজেকে ধরে রেখেছিলাম। পরের দিন একটা শুকনো রুটি পেয়েছিলাম। খেতে গিয়ে মনে হলো, 'দাঁড়াও, দেখি নরম পাই কিনা।' মন বলল, 'আমি এতেই খুশি।' তখন আমি বললাম, 'এমনই তো হওয়া উচিত তোমার!'"

আপনার মন যদি জানে আপনি সিরিয়াস তা হলে সেও সিরিয়াস আর কর্মঠ হবে। আর মন যদি জানে আপনি অলস, তা হলে সে আপনার মনিব বনে যাবে।

এক কবি বলেছেন,

ঘোরসওয়ার তার ঘোড়ার স্বভাব ভালো করেই জানে
তাই সে তাকে বারবার কাহিল করে, ভয় দেখায়

মনের উপর লাগাম চড়ানোর আরও কিছু উপায় হচ্ছে প্রতিটা কথায় কাজে অবহেলার অপরাধের জন্য একে কাঠগড়ায় দাঁড় করান। লাগাম পরানো হয়ে গেলে তখন ঠিকই সেই কষ্ট ব্যথা সে সয়ে নেবে।

সাবিত আল-বুনানী বলেছেন, "বিশ বছর ধরে আমি [সালাত আদায় করে] রাতকে সহ্য করেছি। এর পরের বিশ বছরের রাতে আনন্দ করেছি।"

আবূ য়াযীদ বলেছেন, "চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে আমি আমার প্রভুর দিকে নিজেকে চালিয়ে নিয়েছি। একসময় সে খুশি মনে সেখানে পৌঁছেছে।"

তাছাড়া নিজের মনের অধিকারও ভুলে যাবেন না। শৃঙ্খলাবিরোধী কিছু না হলে মনের বাসনার বিরুদ্ধে যাবেন না। সাধারণভাবে যদি একে এর লক্ষ্য থেকে বাধা দেওয়া হয়, তা হলে অন্তর অন্ধ হয়ে যাবে। দুশ্চিন্তার বিস্ফোরণ ঘটবে। নিজেকে জেলখানায় বন্দী মনে হবে।

মনে রাখুন, সুমহান আল্লাহর কাছে 'ইবাদাতের মর্যাদার চেয়ে আপনার মর্যাদা অনেক বড়। এজন্যই সফরকারীর জন্য তিনি সিয়াম ভাঙার অনুমতি দিয়েছেন। জ্ঞানীরা এটা বেশ ভালো করেই বোঝেন।

সন্তান শাসন

কাঁচা বয়সের শাসন সেরা শাসন। ছেলেমেয়েদের যদি নিজেদের উপর ছেড়ে দেন, আর তখন ওরা যদি একবার আজেবাজে স্বভাব নিয়ে বড় হয়, তখন ওদের ঠিক করা খুব কঠিন হবে।

এক কবি বলেছেন,

বাড়ন্ত শাখাকে চাইলে সোজা করলে সোজা হবে
কিন্তু কাণ্ডকে সোজা করা যায় না
সন্তানকে ধীরে ধীরে শাসন করলে তা কাজ দেয়
বয়স হয়ে গেলে তা আর কাজে দেয় না

শৃঙ্খলার জন্য লেগে থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ নীতি। বিশেষ করে বাচ্চাদের বেলায়। ওদের ভালো স্বভাবটা এভাবে অভ্যাসে পরিণত হয়।

অন্য এক কবি বলেছেন,

বাচ্চাকে নিয়মানুবর্তিতা শেখানোকে হেলা করবেন না
যদিও সে কষ্টের ব্যাপারে নালিশ করে

দেখুন, ডাক্তাররা যখন রোগীর চিকিৎসা করেন, তারা তখন তার বয়স, সে কোথায় থাকে, সময় এসব বিবেচনা করে। এরপর ওষুধ দেয়। সেরকম বাচ্চাদের শেখানোর বিষয়টা তাদের উপযোগী হতে হবে। সেটা কাজে লাগছে কি না তা অল্প বয়স থেকেই বোঝা যায়। চালাক ছেলেমেয়েরা উপদেশে সাড়া

দেয়। কিন্তু যারা সাড়া দেয় না, উপদেশ তাদের কোনো কাজে লাগে না। ঠিক যেমন খেলাধুলো চর্চা করলেই কোনো উটচালক বুদ্ধিমান হয়ে যায় না।

এক লোক একবার সুফ্‌য়ান আস-সাওরীকে বলেছিলেন, "সালাত আদায় করে না বলে আমি আমার ছেলেমেয়েকে মারি।"

তিনি বললেন, "আপনি বরং ওদেরকে [সাওয়াবের] সুখবর দিন।"

যুবাইদ আল-য়াফী তার ছেলেদের বলতেন, "যে সালাত আদায় করবে আমি তাকে পাঁচটা আখরোট দেব।"

ইবরাহীম ইবনু আদহাম বলতেন, "বাবা! হাদীস শেখো। একটা করে হাদীস শিখলে আমি তোমাকে এক দিরহাম করে দেব।" তো তারপর তার ছেলে হাদীসের জ্ঞান অন্বেষণে লেগে পড়ে।

আমানাতের দেখভাল

আপনার ছেলেমেয়ে আপনার আমানাত। আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে সে যেন অল্প বয়স থেকেই খারাপ বন্ধুবান্ধব এড়িয়ে চলে। তাকে ভালো ভালো কাজ আচরণ শেখাবেন। বাচ্চাকাচ্চারা শূন্য কলসির মতো। এখন যা দেবেন, তা-ই নেবে। তাকে লাজুক স্বভাব, দানশীলতা ভালোবাসতে শেখাবেন। ছেলে হলে তাকে সাদা পোশাক পরতে বলবেন। রঙচঙা পোশাক পরতে চাইলে বলবেন ওগুলো মেয়েদের পোশাক। মেয়েলি স্বভাবের নিশানা।

ওদেরকে আপনি ধার্মিক মানুষদের কাহিনি শোনাবেন। অর্থহীন কবিতা থেকে দূরে রাখবেন। এগুলো মনের ভেতরে বিষের বীজ রোপণ করে। দানশীলতা সাহসিকতার মতো সদ্‌গুণকে উদ্দীপ্ত করে এমন-সব কবিতা পড়াবেন। যাতে তার মধ্যে এসব স্বভাব গড়ে ওঠে। সে সাহসী হয়।

ভুল করলে ওদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবেন না। বাচ্চার শিক্ষক কখনো যেন তাদের গোপনীয়তা ভুলত্রুটি অন্যদের বলে না বেড়ায়। বাবা-মা হিসেবে আপনি কখনো লোকজনের সামনে বকাঝকা মারধর করবেন না। অতিরিক্ত

খাওয়াদাওয়া ঘুম থেকে ওদের বারণ করবেন। সাধারণ খাবারদাবার, অল্প ঘুমে অভ্যস্ত করাবেন। এটা বেশি স্বাস্থ্যকর।

হাঁটাচলা দৌড়ের মতো শরীরচর্চা করতে বলবেন। অন্যের দিকে পিঠ ফেরানোর মতো অভদ্রতা থেকে শাসন করবেন। মানুষের সামনে মুখ না ঢেকে হাই তোলা হাঁচি দেওয়া থেকে নিষেধ করবেন।

কোনো খারাপ কাজ যদি তার মধ্যে চলে আসে, তা হলে সেটা যাতে কোনোভাবেই তার অভ্যাসে পরিণত না হয় সেজন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন। কোমল আচরণে কাজ না হলে অল্পবিস্তর শাসন করবেন।

লুকমান তার ছেলেকে বলেছিলেন, "সন্তানকে শাসন করাটা বীজ বোপনে সারের মতো কাজ করে।"

সন্তানের মাঝে যদি দুষ্টামি মনোভাব দেখেন তা হলে কোমল আচরণ করুন। ইবনু 'আব্বাস বলেছেন, "ছেলেদের মধ্যে দুষ্টামি-স্বভাব বাচ্চার বুদ্ধিমত্তা বাড়ায়।"

সন্তানের ভবিষ্যৎ

জ্ঞানী লোকেরা বলতেন, "প্রথম সাত বছর সন্তান আপনার ফুল। পরের সাত বছর আপনার সেবক। চোদ্দ বছরে পৌঁছাতে পৌঁছাতে তার সাথে যদি ভালো থাকেন তা হলে সে হবে আপনার সঙ্গী। তার সাথে দুর্ব্যবহার করলে সে হবে আপনার শত্রু।"

সাবালক হওয়ার পর সন্তানকে মারধোর গালিবকা করবেন না। তা হলে তারা নিজেরা নিজেদের গতি করার জন্য বাবা-মার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে চাইবে। বিশ বছরে পৌঁছার পরও কেউ যদি ধার্মিক না হয়, তা হলে তার জন্য ধার্মিকতা পৌঁছা খুব কঠিন হবে। সে যাহোক, সবার সাথেই কোমল আচরণ করবেন।

স্ত্রী

এই অধ্যায়টা একটু ভালো করে পড়তে হবে। একজন পুরুষের জন্য সবচেয়ে সৎ কাজ কুমারী মেয়েকে বিয়ে করা। যে এর আগে কোনো পুরুষকে চেনেনি।

জ্ঞানীরা বলেছেন, "কুমারী মেয়েরা তোমাদের জন্য। অকুমারীরা তোমাদের বিরুদ্ধে।" কিন্তু বয়স্ক লোকের অল্প বয়সী মেয়ে বিয়ে করা খুব বড় ভুল। কারণ, সে তার সব চাহিদা পূরণ করতে পারবে না। আর একারণে বয়স্ক স্বামীর প্রতি সেই স্ত্রীর মনে অরুচি ধরবে। অল্প বয়সী কোনো স্ত্রীর সাথে বিয়ের পর এমন অবস্থা তৈরি হলে, ভালো আচরণ, সহনশীলতা আর তার পেছনে অঢেল টাকাপয়সা খরচ করে তার মনের অরুচি দূর করার চেষ্টা করতে হবে। আমি আমার *আশ-শাইব* (পাকা চুল) বইতে এবিষয়ে আরও বিস্তারিত বলেছি।

স্ত্রীর সামনে নিজেকে সুন্দর করে তুলে ধরতে হবে। ঠিক যেমন আপনি চান আপনার স্ত্রী আপনার সামনে সৌন্দর্যের পসরা মেলে ধরুক। শরীরের যা দেখতে স্ত্রী পছন্দ করে না তার সামনে সে অংশ অনাবৃত রাখবেন না। স্ত্রীরও সেরকম করা উচিত।

যেসব কারণে স্ত্রী বিপথে যায়

স্ত্রীর সাথে খুব বেশি কৌতুক করবেন না। তাতে একসময় স্ত্রী আপনাকে হাসিতামাশার পাত্র মনে করবে। অবাধ্য হবে। রোজগারের সব টাকা স্ত্রীর হাতে তুলে দেবেন না। যাতে আপনি তার অধীনে না থাকেন। টাকা পেয়ে সে আপনাকে ছেড়ে যেতে পারে। সুমহান আল্লাহ্ বলেছেন,

“আল্লাহ যা দিয়ে তোমাদের আয়রোজগারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, সেই টাকা দুর্বলমনের মানুষদের হাতে তুলে দিয়ো না।

[আন-নিসা’, ৪:৫]

হাসিঠাট্টা করবেন, তবে নিজের মর্যাদা ঠিক রেখে।

জীবনসঙ্গীকে শৃঙ্খলা শেখাবেন কীভাবে

স্ত্রীকে শৃঙ্খলা শেখানোর সেরা উপায় হচ্ছে, অধার্মিক আজেবাজে নারীদের সাথে কথা বলতে দেবেন না। বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হতে দেবেন না। বয়স্ক জ্ঞানী মহিলাকে দায়িত্ব দেবেন তাকে শেখাতে। তিনি তাকে শেখাবেন কীভাবে স্বামীকে শ্রদ্ধা করতে হবে, স্বামীর অধিকার আর যারা রয়েসয়ে খরচ করে তাদেরকে মর্যাদার চোখে দেখতে। তিনি তার সুরক্ষাকারী হিসেবে কাজ করবে।

যৌবনের উন্মত্ততা খুব ভয়ংকর।

সমবয়সী বিয়ে করা

বয়স্ক ব্যক্তি এমন নারীকে বিয়ে করবেন যে কৈশোর পার করেছে, কিন্তু প্রৌঢ় নয়। এতে সংসার জীবন সবচেয়ে উপযোগী হবে। এমন স্ত্রীরা স্বামীর উপর কর্তৃত্ব ফলায় না; বরং তার প্রতি অনেক বেশি শ্রদ্ধাশীল থাকে।

স্ত্রীকে নিয়ে তুষ্ট থাকা

ঠিক যেমনটা চেয়েছিলেন যদি অনেকটা সেরকম স্ত্রী পেয়ে থাকেন, তা হলে কী পাননি সেগুলো নিয়ে আর আফসোস করবেন না। যা পেয়েছেন তা মাথায় রেখে যা পাননি তা ভুলে যান। শেকড়বাকড় কাণ্ড ঠিক থাকলে শাখাপ্রশাখা কিছু না থাকলে সেগুলো কজন উল্লেখ করে? তাছাড়া অসন্তুষ্ট হয়ে একাধিক বিয়ে করলে সমানুপাতিক হারে দায়িত্বও বাড়ে। সেই দায়িত্বের মধ্যে সবচেয়ে কমটাও অনেক: তাদের ঠিকমতো দেখভাল করা।

পরিবার, কাজের লোক

পরিবারের লোকজন যদি দেখে টাকাপয়সায় মর্যাদায় আপনি তাদের ছাড়িয়ে গেছেন, তারা তখন আপনাকে হিংসে করতে পারে। কিন্তু তাদের সাথে যেহেতু সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না, সেজন্য তাদেরকে কৌশলে সামলাতে হবে। বিষয়টা বেশ জটিল নিঃসন্দেহে। তারা আপনার ব্যাপারে যা জানে না, সেটা তাদেরকে না জানতে দিয়ে ভালো সদয় আচরণ করবেন।

পরিবারের কাউকে অন্যের চেয়ে প্রাধান্য দিলে সবচেয়ে খারাপ ভুলটা করবেন। যদি কোনো কারণে করতে হয়, তা হলে সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন অন্যদের থেকে তা গোপন রাখতে। না হলে এর কারণে অন্যরা তাকে ঘৃণা করবে।

দাসদাসীরা (কাজের লোকেরা) সত্যি বলতে তাদের মনিবের মালিক। খানাপিনার দায়িত্ব তারাই দেখে। এজন্য তাদের সাথে আপনাকে সদয় হতে হবে যাতে ওদের হাতে আপনি মারা না পড়েন [খাবার বা পানিতে বিষ মেশানোর ফলে]। বিযূর জামহুর বলেছেন,

> আমরা আমাদের লোকদের রাজা। আর আমাদের রাজা আমাদের কাজের লোকেরা। তাদের ব্যাপারে পুরোপুরি সতর্ক হওয়া সম্ভব না। এজন্য ওদের সঙ্গে জ্ঞানবুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করি।
>
> একজন রাজাকে ওদের সাথে মর্যাদা রেখে চলতে হবে। কোমল আচরণ করতে হবে। যারা তার খানাপিনার দায়িত্বে তাদের সাথে আরও বেশি কোমল হতে হবে।

আপনার কাজের লোক দাসদাসী যদি চতুর হয়, তা হলে আপনার কাছ থেকে কোনো কিছু লুকিয়ে ধোঁকা দিতে পারে। আবার বোকাসোকা হলে তাদের থেকে কোনো উপকারই পাবেন না। কারণ, তারা বুঝবেই না আপনি কী চান। সেজন্য তা পূরণও করতে পারবে না।

সঠিক উপায় হচ্ছে বোকাসোকা লোক ঘরের ভেতর রাখবেন। আর চালাকচতুর লোককে বাইরের কাজে রাখবেন। তা হলে আপনার সব ধরনের চাহিদা নিরাপদে পূরণ হবে।

সতর্ক থাকা

তরুণ বয়সী কাজের ছেলেকে ঘরের ভেতরের কাজে রাখলে খুব ভুল করবেন। বিশেষ করে দেখতেশুনতে যদি ভালো হয় তা হলে তো বিপদ আরও বেশি। ঘরে মেয়েরা থাকলে তারা এই ছেলের প্রতি দুর্বল না হলেও সে তাদের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। আবার সাবালক ছেলেকে দাসীদের মাঝে ছেড়ে দিলে অন্য বিপদ। শারীরিক চাহিদার তীব্রতা আর ঐ বয়সের উড়ুউড়ু মন অবৈধ শারীরিক সম্পর্কে জড়ানোর মতো ভয়াবহ হারামকেও ভুলিয়ে দেয়।

সঠিক ওষুধ প্রয়োগ করে এগুলোর প্রতিকার করতে হবে। খারাপ কোনো ঘটনা ঘটে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে না।

মানুষের সাথে মেলামেশা

মানুষের প্রকৃতি যেমন বৈচিত্র্যময় তেমনি নানামুখী। সবার সাথে মিলেমিশে চলা কঠিন। বুদ্ধিমান মানুষের জন্য সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে নিজেকে আলাদা রাখা। নিজেকে নিজের হাওয়ালে রাখা। এতেই স্বস্তি, প্রশান্তি।

তবে চলতে ফিরতে মানুষজনের সাথে যেহেতু মিশতেই হয়, সেক্ষেত্রে সদয়ভাবে সেটা করতে হবে। কোমল আচরণ করতে হবে। নিজের অধিকার ভুলে তাদের অধিকার ঠিক রাখতে হবে। নির্বোধ লোকদের সাথে ধৈর্য ধরতে হবে। অন্যায়কারীদের ক্ষমা করতে হবে। অহংকারী লোকদেরকে মজলিসের ভালো আসনে জায়গা করে দিতে হবে। তাদের ভালোবাসা পাওয়ার সেরা উপায় ক্ষমা আর দান। তাছাড়া যাদেরকে চালানো দুষ্কর এদুটোর মাধ্যমে আপনি তাদেরকে অধীনে রাখতে পারবেন। হাদীসে উল্লেখ আছে, "লোকদের সাথে বুঝেসুঝে চলা এক প্রকারের দান।"

সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা

'আলিমকে অনেক সময়ে একদম সাধারণ মানুষদের সাথে মিশতে হয়। তাদের সাথে উঠাবসা করার বেলায় খুব সতর্ক থাকতে হবে। তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য 'আলিমদের মতো না। কেউ কোনো একটা নিয়ে খুশি তো অন্যজন সেটা নিয়েই অখুশি। আবার কাউকে কাউকে শুধরে দিলে সে রেগে যায়। তারা সঠিকটাকে ভুল মনে করে। নিজে জানে না, তারপরও 'আলিমরা যা বলে তারা তা মেনে নেয় না।

আপনি 'আলিম হলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যতটা সম্ভব ঘনিষ্ঠতা এড়িয়ে চলবেন। খুব বেশি মেলামেশা অসম্মান নিয়ে আসবে। তাদের চোখে আপনি ছোট হয়ে যাবেন। আপনার জ্ঞানের অবমূল্যায়ন করবে তারা।

পাপী লোকেরা 'আলিমকে হাসতে খেতে দেখলে বা তার বিয়েশাদির কথা শুনলে তার ব্যাপারে খারাপ ধারণা নেয় [তারা ভাবে এই লোকও দুনিয়াবি সুখ খুঁজছে, পরকালীন না]। এজন্য এদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখবেন। বনি ইসরাইলের সময়ে এসব সাধারণ মানুষেরাই ছিল নবিদের হত্যাকারী।

সামাজিক যোগাযোগের খাতিরে কথাবার্তা বলতে গেলে খুব বেশি কথা বলবেন না। এমনভাবে কথা বলতে যাবেন না, যাতে তারা মওকা নিতে পারে। বা তাদের সাথে যেসব বিষয়ে কথা বলা আপনার জন্য শোভন না সেসব বিষয়ে কথা বলবে না। এভাবে চললে তাদের থেকে নিরাপদে থাকবে পারবেন।

নিখাদ চরিত্র

খাঁটি তহীন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: ছোট বয়স থেকেই সত্যের প্রতি অনুরাগ, সঠিক সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা, যুবক বয়সেই বিচক্ষণ মাথা। সুমহান আল্লাহ্ বলেছেন,

> "আমি অবশ্যই ইবরাহীমকে আগে দিকনির্দেশ দিয়েছিলাম।"
>
> [আম্বিয়া', ২১:৫১]

নিখাদ চরিত্র অর্জন করতে হলে আপনার ভেতরে এমন কিছু থাকতে হবে যেটা বড় বড় স্বপ্নকে বাস্তব করতে পারবে। নীচু কাজ থেকে বিরত রাখতে পারবে। ছোট বয়সে খেলাধুলা করে এমন অনেক বাচ্চাকে দেখা যায় তারা অন্যান্য বাচ্চাদের নেতা হতে পছন্দ করে। সে যখন বড় হবে এ ধরনের ভালো বৈশিষ্ট্যগুলো এমনিতেই তার মাঝে মুদ্রিত হয়ে যাবে। আলাদা করে শিখতে হবে না। লাজুক-স্বভাব হবে তার পোশাক, তাকে এজন্য বাধ্য করা লাগবে না। অল্প অনুশাসনেই তার মধ্যে প্রভাব পড়বে। ঠিক যেমন শানপাথর স্টিলে কাজে লাগে, লোহায় কোনো কাজ করে না।

সে যখন বুদ্ধিবিবেচনার বয়সে পৌঁছাবে, আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ জানবে, কেন তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেটা বুঝবে, কুর'আনের বাণী, তার শেষ গন্তব্য সবকিছুর মর্ম নিয়ে ভাববে, তখন সে পরকাল অর্জনে কোমর বেঁধে নামবে। জ্ঞান তার সামনে সবকিছুর বাস্তবতা মেলে ধরবে। সে বুঝবে যা তাকে আল্লাহর কাছে নিয়ে আসে সেটাই সবচেয়ে দামি। সেই দামি জিনিসটা হচ্ছে জ্ঞান আর সে অনুযায়ী কাজ। শরীরে যতটুকু কুলোয় তার সবটুকু নিংড়ে সে তা অর্জনের চেষ্টা করবে। নিয়্যাতকে চাঙা করে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আপনি কখনো কখনো দেখবেন কেউ জ্ঞানের শুধু একটি অংশে নিজেকে আটকে রেখেছেন। এই যেমন কেউ সারাজীবন শুধু ব্যাকরণ পড়ছেন। কেউ হাদীস-শাস্ত্র।

কিন্তু এই লোকটি জানে সব ধরনের জ্ঞানই গুরুত্বপূর্ণ। সে জানে সব ধরনের জ্ঞান এই সীমিত আয়ুর জীবনে অর্জন করা অসম্ভব। সেজন্য যেখান থেকে যতটুকু তার উদ্দেশ্য পূরণে প্রয়োজন, সে তা কুড়িয়ে নেয়। তার জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করে।

সময় থেকে মুনাফা বের করে নেয়। কারণ, সে শঙ্কায় থাকে কখন এ সময় ফুরিয়ে যায়। অদরকারি অনর্থক কাজে একটা ক্ষণও নষ্ট করে না সে। এমনকি খাওয়াদাওয়া ঘুমের সময়টারও ফায়দা নেয়। কারণ, সময় খুব খুব কম।

এক কবি বলেছেন,

দ্রুত তোমার লক্ষ্য হাসিল করো
তোমার বয়স এক সফর ছাড়া আর কী!
ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো দৌড়াও, প্রথম হও
ওগুলো তোমাকে ধার দেওয়া হয়েছে, একদিন ফেরত দিতে হবে।

সময়ের প্রতিটা সেকেন্ড কল্যাণকর কাজ দিয়ে রাঙিয়ে নিতে সে সদাসংগ্রামে রত। সে তার খায়েশকে বশে রাখে আচরণ ঠিক করার জন্য। সে শুধু উপকারী জ্ঞান শেখে।

তার মনটা ব্যস্ত থাকে খায়েশের মুখে লাগাম পরাতে। তার শরীরের প্রতিটি কণা আল্লাহর প্রতি সমর্পিত। আল্লাহ যা দিয়েছেন তা নিয়ে সে খুশি। অন্যের কাছে হাত পাতে না। নিজের মর্যাদা ধরে রাখতে অন্যের কাছে ভিক্ষা করে না। এজন্য সে তাদের চেয়ে ভালো। সে আত্মনির্ভরশীল। সে নাসীহাহ-সদুপদেশ ছড়িয়ে দিয়ে অন্যের খারাপ স্বভাব দূর করে।

মানুষের সাথে ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ করে সে। তার মর্যাদার কারণে সে নিজেকে আরও উঁচুতে তোলার সাধনায় মগ্ন। কেউ উপদেশ চাইলে সে

ভালোভাবে উপদেশ দেয়। নিজেকে সংশোধন-সাধনার কারণে সে বাকিদের চেয়ে আলাদা। অন্যভুবনে যাওয়ার জন্য তার [ভালো কাজের] মালপত্র গুছিয়ে সে প্রস্তুত। প্রতিটা সেকেন্ডের সদ্ব্যবহার করে সে। রসদের জোগান রেখে নিজেকে শক্তিশালী করে। সে জানে এই সফর অনেক লম্বা। সে তার জ্ঞান পরিশোধন সংগ্রামে রত। যাতে মৃত্যুর পর তার পদচিহ্ন রয়ে যায়।

সে দুনিয়াবিমুখ। সারাদিন চলার জন্য যতটুকু না হলেই না, শুধু ততটুকু দিয়েই পেট ভরে সে। অনুমোদিত বৈধ কিছু থেকে যদি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি নেয়, তা হলে সেটা শুধু তার উটের শক্তি বাড়ানোর জন্য। যাতে সেটা তাকে বহন করে নিতে দুর্বল না হয়।

সে তার প্রভুর অনুগ্রহে থাকতে থাকতে একসময় প্রতিটি নিঃশ্বাসে তাঁকে ভালোবাসতে শুরু করে। তাঁর তরে প্রবল অনুরক্ত হয় তখন। আল্লাহর ভাবনা এত ভালো লাগে, লোকজনদের সাথে থাকলে দেহ তাদের সাথে থাকলেও মন পড়ে থাকে আল্লাহর কাছে।

এসব মানুষেরা পৃথিবীতে আল্লাহর সবচে প্রিয় মানুষ। অনুসারীরা তাদের সুবাস তাদের কথামালা বুক ভরে টেনে নেয়। কবরে দাফনের পরও তাদের সত্যবাদিতার সৌরভ ছড়াতে থাকে। তাদের কবরে আছে সম্মান। সেটা বলে দেয় তাদের প্রত্যেকের মর্যাদা।

তাদের কাজগুলো শুনলে অনুসারীদের মধ্যে ধৈর্যশক্তি বাড়ে। বিচারদিনে ধার্মিকেরা হবে মহাবিশ্বের নক্ষত্র। তারা হবেন হয় সূর্য বা চাঁদের মতো।

আল্লাহ আমাদেরকে তাদের অনুকরণের সামর্থ্য দিন। তাদের মতো মর্যাদা দিন। তাদের নৈতিকতার চাদরে আমাদের অলঙ্কৃত করুন। তিনি তো সব শোনেন।

তিনি তাঁর দাসদের সবচে কাছের।

আল্লাহর শান্তি ও আশিস বর্ষিত হোক শেষ নবি মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও সাহাবিদের উপর।

লেখকের জীবনী

আবুল-ফারাজ জামালুদ-দীন ইবনু 'আলী ইব্‌নুল-জাওযীর জন্ম ৫০৯ বা ৫১০ হিজরি সনে। ইংরেজি সালের হিসেবে সেটা ১১১৬ সালের দিকে। আমাদের কাছে তিনি ইবনুল-জাওযী নামেই পরিচিত। খালীফাহ আবু বাক্‌র আস-সিদ্দিকের ছেলে মুহাম্মাদের বংশধর তিনি। জন্ম ইরাকের বাগদাদে। তিনি ছিলেন হানবালী মাযহাবের অনুসারী।[১]

পড়াশোনার প্রথম পাঠ শাইখ ইবনু নাসিরের কাছে। কিশোর বয়সে তার খালা তাকে উনার কাছে নিয়ে যান। ইসলামের নানা বিষয়ে তার কাছেই হাতেখড়ি। দীন-প্রচারে তখন থেকেই দুর্বার আকর্ষণ খুঁজে পান এই মহতি মনীষী। ছোটো ছোট খুতবা দিতে শুরু করেন এখানে ওখানে।

মাত্র তিন বছর বয়সে বাবাকে হারিয়েছেন। এরপর ফুফুর কাছে বেড়ে ওঠা। তার আত্মীয়স্বজনেরা ছিলেন তামা ব্যবসায়ী। এজন্য কখনো কখনো হাদীসের মজলিশে তার নাম লিখতেন 'আবদুর-রাহমান ইবনু 'আলী আস-সাফ্‌ফার। সাফ্‌ফার মানে তাম্রকার।

আয-যাহাবি বলেছেন, ১১৬০ সালের দিকে তিনি প্রথম হাদীসের মজলিশে হাদীস শেখানো শুরু করেন।[২]

---

[১] সাইলুর-রাউদাতাইন, পৃষ্ঠা ২১, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, পৃষ্ঠা ১৩/২৬

[২] সাইলুর-রাউদাতাইন, পৃষ্ঠা ২১, সাইল'আলা তাবাকাতুল-হানাবিলা, ১/৪০১, শাসারাতুল-সাবাব, ৪/৩৩০

অল্প বয়সেই ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে তার নামডাক ছড়িয়ে পড়ে। অবসর সময়ে মানুষদের সাথে অযথা সময় নষ্ট করতেন না। খাবারের উৎস সন্দেহজনক উপার্জন থেকে হলে খেতেন না। কেবল সালাতের সময় ঘর থেকে বের হতেন। সমবয়সীদের সাথে খেলতে যেতেন না একেবারেই। চোয়ালবদ্ধ সংকল্পের অধিকারী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এক মানুষ ছিলেন ইবনুল-জাওযী। সারাটা জীবন বিনিয়োগ করেছেন জ্ঞান অন্বেষণ, প্রচার আর লিখনীতে।[১]

তার শিক্ষকেরা

নিজের শিক্ষকদের নিয়ে 'মাশ্‌য়াখাত ইবনুল-জাওযী' নামে বই লিখেছেন তিনি। সেখানে তার অনেক শিক্ষকের কথা বলেছেন। হাদীস-শাস্ত্রে তার উস্তায ছিলেন ইবনু নাসির। কুর'আন ও আদব বিষয়ে সিবতুল-খিয়াত ও ইবনুল-জাওয়ালিকী। আদ-দিনাওয়ারি এবং আল-মুতাওয়াক্কিলি থেকে সর্বশেষ হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন তিনি।[২]

তার ছাত্ররা

তার কাছে থেকে যারা বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে আছেন তার ছেলে বিখ্যাত 'আলিম মুহিউদ-দীন ইউসুফ। আল-মুসাতা'সিম বিল্লাহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ছিলেন তিনি। এছাড়া আছেন তার বড় ছেলে 'আলী আন-নাসিখ, তার নাতি দা'ঈ শামসুদ-দীন ইউসুফ ইবনু ফারগালী আল-হানাফী—মির'আতুয-যামান একটি বই আছে তার। এছাড়া আছেন আল-হাফিয 'আবদুল-গানী, শাইখ মুওয়াফ্‌ফাকুদ-দীন ইবনু কুদামা, ইব্‌নুদ-দুবায়সী, ইবনুল-নাজ্জার এবং আদ-দিয়া।[৩]

---

[১] আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ১৩/২৯, সাইদুল-খাতির, ২৩৮।

[২] সিয়ারুল-আ'লামুন-নুবুলা', ২১/৩৬৬, ৩৬৭।

[৩] সিয়ারুল-আ'লামুন-নুবুলা', ২১/৩৬৭।

তার ছেলেমেয়ে

বেশিরভাগ জীবনী-লেখকেরা বলেছেন তার ছেলে ছিল তিনজন।

- বড় ছেলের নাম আবু বাক্‌র 'আবদুল-'আযীয। তিনি হানবালী মাযহাবের ফাকীহ ছিলেন। ফাকীহ মানে ইসলামি আইনজ্ঞ। আবুল-ওয়াক্ত, ইবনু নাসীর, আল-আরমাউঈসহ বাবার অনেক শিক্ষকের কাছে তিনি পড়াশোনা করেছেন। একটা সময় তিনি বর্তমান ইরাকের মুসুল নগরীতে দীনের প্রচার-প্রসারের কাজ করেছেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন সময় নানা বিষয়ে খুতবা দিতেন। স্থানীয় লোকজনের কাছে তার বেশ কদর ছিল। লোকে বলাবলি করে, আয-যাহরাযুরী পরিবারের লোকজন তাকে হিংসা করত। এরা চক্রান্ত করে কাউকে দিয়ে তার পানির মধ্যে বিষ মিশিয়ে তাকে মেরে ফেলে। সেই বিষের ক্রিয়াতেই ১১৬০ সালে তার মৃত্যু হয়।[১] বাবা ইবনুল-জাওযী তখনো বেঁচে।

- মেঝো ছেলের নাম আবুল-কাসিম বাদরুদ-দীন 'আলী আন-নাসিখ। তার ব্যাপারে বলার মতো তেমন কিছু নেই।

- ছোট ছেলের নাম আবু মুহাম্মাদ য়ূসুফ মুহিউদ-দীন[২]। জন্ম ১১৮৫ সালে। ছেলেদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে মেধাবী ছিলেন। একাধারে তিনি ছিলেন 'আলিম, দা'ঈ, খাতিব। বাবার মৃত্যুর পর বাবার জায়গায় তিনি খুতবা দিতে শুরু করেন। আর তাতে ছাড়িয়ে যান সবাইকে। সমকালীন 'আলিমরা তার নামডাকের কারণে তার সাথে দেখাসাক্ষাৎ করতে আসতেন। একসময় তাকে দেওয়া হয় বাগদাদের বাজার নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব। পরে খালীফাদের চিঠি বিভিন্ন অঞ্চলের রাজাদের কাছে নিয়ে যাওয়ার নতুন দায়িত্ব পান। ১২৪৩ সালে খালীফাহ আল-

[১] সাইল তাবাকাতুল-হানাবিলা, ১/৪৩০, ৪৩১।

[২] দেখুন, সিয়ারুল-আ'লামুন-নুবুলা', ২৩/৩৭২, আল-'ইবার, ৫/২৩৭, দূউালুল-ইসলাম, ২/১২২, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ১৩/২০৩, সাইল তাবাকাতুল-হানাবিলা, ২/২২৫৮-২৬১, আল-'উসজুদুল-মাসবুক, ৬৩৫, সাসারাতুল-সাবাব, ৫/২৮৬, ২৮৭, ইবনু শাত্তী: মুখতাসার তাবাকাতুল-হানাবিলা, পৃষ্ঠা ৫৭।

মুসতা'সিমের প্রতিষ্ঠানে তিনি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। এরপর এল সেই কালসময়। হালাকু খান বাগদাদ দখল করে পুরো শহর ধ্বংস করে ফেলল। অসাধারণ এই 'আলিমকে জেলে বন্দী করল অত্যাচারী হালাকু খান। জেলবন্দী অবস্থাতেই ১২৫৮ সালে তাকে হত্যা করে তারা। তার তিন ছেলে জামালুদ-দীন, শারাফুদ-দীন ও তাজুদ-দীনকেও একসাথে মেরে ফেলে ওরা। অসংখ্য বইপত্র লিখেছেন তিনি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য *মা'আদিনুল-আবরিয ফি তাফসীরুল-কিতাবুল-'আযীয* ও *মাযহাবুল-আহমাদ ফি মাযহাবুল আহমাদ।* মেঝো ভাই আবুল-কাসিমের মতো অবাধ্য ছিলেন না তিনি। বাবাকে ভীষণ শ্রদ্ধা করতেন।

ইবনুল-জাওযীর জীবনীকারদের মধ্যে একজন ছিলেন তার নাতি আবূল-মুযফির। তিনি বলেছেন তার বেশ কয়েকজন কন্যা ছিল। তারা হলেন রাবি'আ, শারাফুন-নিসা', যায়নাব, জাউহারা, সিত্তুল-'উলামা আস-সুগরা এবং সিত্তুল-'উলামা আল-কুবরা[১]।

দীনপ্রচারক হিসেবে তার অনন্যতা

আয-যাহাবি তার দা'ওয়াহ-কার্যক্রম নিয়ে চমৎকার কিছু কথা বলেছেন:

> মানুষকে দীনের বিষয়-আশয়গুলো স্মরণ করিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। তার মতো করে খুব কম মানুষই কথা বলতে পারতেন। কখনো তিনি মনোমুগ্ধকর কবিতা আবৃত্তি করতেন, কখনো-বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সরলসিধা কথামালা দিয়ে সাজাতেন নাসীহার পঙ্ক্তিগুলো। সুন্দর শব্দচয়নে মানুষের মনকে নাড়িয়ে দিতে পারতেন। এর অজস্র উদাহরণ আছে তার সোনালি জীবনে। তার আগে এমন কেউ ছিল না; তার পরেও না। যতভাবে মানুষকে নাসীহাহ দেওয়া যায় তিনি ছিলেন তার জীবন্ত প্রমাণ। তার পোশাক-আশাক ছিল দৃষ্টিসুখকর। গলার স্বর শুনে কান আরাম পেত। তার কথা মানুষের মনে

---

[১] মির'আতুল-যামান, ৮/৫০৩, আবূ শাম্মা: সাইলুর-রাউদাতাইন, ২৬।

প্রভাব ফেলত। জীবনযাপন পদ্ধতি ছিল সুন্দর।[১] আমার বিশ্বাস তার মতো অন্য কেউ আর হবে না।[২]

ইবনু রাজাব বলেছেন,

> তার নাসীহার বৈঠকগুলো ছিল একেবারেই অন্যরকম। আগে কেউ এমনটা শোনেনি। অনেক ফায়দা হতো এসব মাজলিসে। বেখেয়ালি মানুষের টনক নড়ত। বেখবর মানুষ জানতে পারত। অপরাধীরা অনুশোচনা করত। আর বহুঈশ্বরপূজারিরা মুসলিম হতো।[৩]

'আল-আযউইবা আল-মিসরিয়্যাহ' বইতে শাইখুল-ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যাহ বলেছেন,

> বিভিন্ন শাস্ত্রে শাইখ আবুল-ফারাজের দক্ষতা ছিল দেখার মতো। এসব বিষয়ে তিনি প্রচুর বই লিখেছেন। গুনে দেখেছি তার বইয়ের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গেছে। পরে অবশ্য আমি তার অন্যান্য কাজেরও সন্ধান পেয়েছি।[৪]

তার কিছু বইপত্রের কথা উল্লেখ করার পর আয-যাহাবী অন্য এক জায়গায় বলেছেন, "উনি যা লিখেছেন তা আর কেউ লিখেছেন বলে আমি জানি না।"[৫]

গুণী শিক্ষক 'আবদুল-হামীদ আল-'আলূযী তার বিভিন্ন কাজ নিয়ে একটা বই লিখেছিলেন। ১৯৬৫ সালে এটি বাগদাদে প্রকাশিত হয়। এই বইতে তিনি তার বইগুলোর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির অনুসন্ধান চালিয়েছেন। সবগুলোকে তিনি বর্ণমালার ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী সাজিয়েছেন। যারা তার বইগুলোর ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চান তারা এই বইটি দেখতে পারেন। এখানে উল্লেখ করা বেশিরভাগ বই-ই ছাপা হয়েছে।

---

[১] সিয়ারুল-আ'লামুন-নুবুলা', ২১/৩৬৭।

[২] ঐ, ২১/৩৮৪।

[৩] সাইল তাবাকাতুল-হানাবিলা, ১/৪১০।

[৪] ঐ, ১/৪১৫, আত-তাজুল-মুকাল্লাল, ৭০।

[৫] তাযকিরাতুল-হুফ্ফায, ১৩৪৪।

ইমাম ইবনুল-জাওযী রাহিমাহুল্লাহ প্রায় ৩০০ বই রচনা করেছেন। ছাপা বইগুলোর মধ্যে আছে:

- *তালকিহ ফুহূম আহলিল-আসার ফি মুখতাসারিস-সিয়ারী ওয়াল-আকবার*।[১]। [একটি অংশ ছাপা হয়েছে]
- *আল-আসকিয়া' ওয়া আকবারাহুম*।[২] [প্রকাশিত]
- *মানাকিব 'উমার ইবনু 'আবদুল-আযীয*।[৩] [প্রকাশিত]
- *রাউহুল-আরওয়াহ*।[৪] [প্রকাশিত]
- *শুযূরুল-'উকূদ ফি তারিখুল-'উহূদ*।[৫] [পাণ্ডুলিপি]
- *যাদুল-মাসির ফি 'ইলমুত-তাফসীর*।[৬] [প্রকাশিত]
- *আল-মুনতাযাম ফি তারিখুল-মুলূক ওয়াল-উমাম*।[৭] [শুধু ৬ খণ্ড প্রকাশিত]
- *আয-যাহাবুল-মাসবুক ফি সিয়ারিল-মুলূক*।[৮] [পাণ্ডুলিপি]
- *আল-হামকা ওয়াল-মুগাফ্ফালিন*।[৯] [প্রকাশিত]

---

[১] নবিজি ﷺ ও সাহাবিদের নিয়ে ঐতিহাসিক ঘটনার সংগ্রহ।

[২] বুদ্ধিমান বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন ঘটনা সংগ্রহ।

[৩] খালীফাহ 'উমার ইবনু 'আবদুল-'আযীযের গুণাবলি নিয়ে।

[৪] আত্মা ও আধ্যাত্মিকতার বিবরণ।

[৫] তারিখুল-মুলূক ওয়াল-উমাম বইয়ের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

[৬] তাফসীর শাস্ত্রের উপর।

[৭] নানা জাতি ও বাদশাহদের কাহিনি।

[৮] ইতিহাসজুড়ে নানা নেতা ও বাদশাহদের নিয়ে।

[৯] বেখেয়ালি নির্বোধ লোকদের কাহিনি।

- *আল-ওয়াফা ফি ফাদা'ইলিল-মুসতাফা।*[১] [প্রকাশিত]
- *মানাকিব 'উমার ইবনুল-খাত্তাব।*[২] [প্রকাশিত]
- *মানাকিব আহমাদ ইবনু হানবাল।*[৩] [প্রকাশিত]
- *গারিবুল-হাদীস।*[৪] [প্রকাশিত]
- *আত-তাহকীক।*[৫] [শুধু প্রথম খণ্ড প্রকাশিত]

এগুলো ছাড়া অন্যান্য আরও অনেক বিষয়েও তিনি বই লিখেছেন।

১২০১ সালের ১২ই রামাদান শুক্রুবার ইব্‌নু-জাওযী মারা যান। বাব হার্ব কবরস্থানে ইমাম আহমাদ ইবনু হানবালের পাশে তাকে সমাহিত করা হয়।

---

[১] নবিজির গুণাবলি নিয়ে।

[২] 'উমার ইবনুল-খাত্তাবের গুণাবলি নিয়ে।

[৩] ইমাম আহমাদ ইবনু হান্‌বালের গুণাবলি নিয়ে।

[৪] হাদীসশাস্ত্রের গারীব হাদীস বিষয়ে।

[৫] বইটি আল-কাদি আবূ য়া'লা রচিত আত-তা'লিকুল-কাবির বইয়ের বর্ণনাগুলো যাচাই নিয়ে এবং কীভাবে হাদীসের মান যাচাই 'আলিমদের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রভাব ফেলেছে।

শারঈ সম্পাদক পরিচিতি

এই পৃথিবীতে চোখ মেলেছেন ১৯৯২ সাল ১৬ জানুয়ারি। জন্মস্থান নোয়াখালি জেলার সোনাইমুড়ির কেশারখিল গ্রামে। তিনি কুর'আনের হাফিয। হাজী নূর মুহাম্মাদ তার গর্বিত পিতা। গর্ভধারিণী মা তাজ নাহার।

মক্তব গমনের মধ্য দিয়ে তার পড়ালেখার হাতেখড়ি। এরপর কবছর নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা। তারপর ঢাকার টিকাটুলি জামে মসজিদে অবস্থিত 'তাহফীজুল কুরআন মাদরাসায়' ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই হিফ্য সমাপন করেন। এরপর ভর্তি হন ঢাকার বিখ্যাত ধর্মীয় বিদ্যাপীঠ যাত্রাবাড়ি বড় মাদরাসায়। সেখান থেকেই অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে তাকমীলে হাদীস সমাপন করেন এবং মাদরাসাগুলোর সম্মিলিত শিক্ষাবোর্ড 'আল-হাইআতুল-'উলইয়া'-এর কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় মেধাতালিকায় ১২তম স্থান অর্জন করেন। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানেই উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগে অধ্যয়নরত আছেন।

ছাত্র জীবনেই সাহিত্যের আসরে তার আনাগোনা। তীব্র নেশা বইপাঠে। লেখালেখি করছেন অনেকদিন ধরে। প্রবন্ধ ও গবেষণাধর্মী মৌলিক রচনায় বেশি মনোযোগী। অনুবাদেও পিছিয়ে নেই। তার প্রথম মৌলিকগ্রন্থ 'নাস্তিকতার স্বরূপ সন্ধান' ইতোমধ্যে পাঠকদের দৃষ্টিআকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে: *হে যুবক তোমাকেই বলছি*, *কী পড়বেন কীভাবে পড়বেন*, *ছাত্রদের বলছি*, *উম্মাহর প্রতি ঐক্যের আহ্বান*, *রাগ করবেন না*, *সালাফদের ইলমী শ্রেষ্ঠত্ব* ইত্যাদি।

জেনারেল শিক্ষিত মানুষের মধ্যে দাওয়াতী কাজ করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণে তিনি আগ্রহী। প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াকে দাওয়াহ কার্যক্রমের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেন। লেখালেখির মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিমদের খেদমতে তিনি বদ্ধপরিকর।
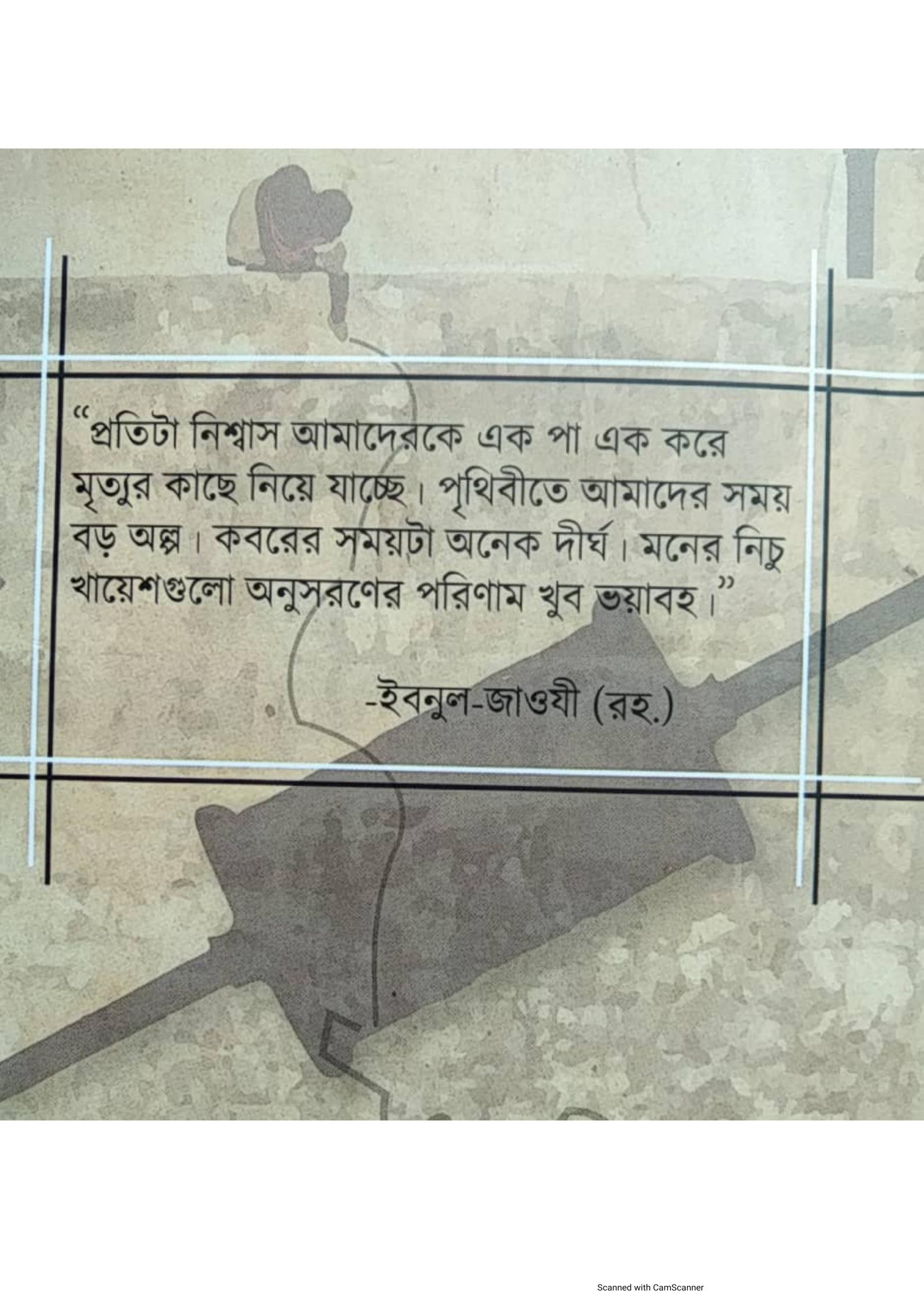
"প্রতিটা নিশ্বাস আমাদেরকে এক পা এক করে
মৃত্যুর কাছে নিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে আমাদের সময়
বড় অল্প। কবরের সময়টা অনেক দীর্ঘ। মনের নিচু
খায়েশগুলো অনুসরণের পরিণাম খুব ভয়াবহ।"
-ইবনুল-জাওযী (রহ.)